মনের মতো মেয়ে
বুদ্ধদেব বসু

প্রকাশিক—শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার

দেব সাহিত্য-কুটীর

১২।৫ বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

শুভ বৈশাখ

১৩৫৮

দুই টাকা

প্রিণ্টার—এস্, সি, মজুমদার

দেব প্রেস

২৪, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

মনের মতো মেয়ে

কনকনে ঠাণ্ডা রাত্রি, ডিসেম্বর মাস। টুণ্ডলা ষ্টেশনের ফার্ষ্ট ক্লাশ ওয়েটিংরুমে চার জন যাত্রী নিঃশব্দে ব'সে আছেন। চার জনেরই ওভারকোট গায়ে, পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢাকা, তবু রেল-কোম্পানির মাপজোকমতো বানানো এবং সাজানো সেই হৃদয়হীন কামরার নিস্তেজ আলোতেও বোঝা যাচ্ছে যে, চার জন চার জাতের মানুষ, সংসারের বিভিন্ন বিভাগ থেকে ছিটকে আজ এখানে এসে জুটেছেন। ইজি-চেয়ারে যিনি ছড়িয়ে আছেন তাঁর প্রকাণ্ড বলিষ্ঠ শরীর—হয়তো একটু অশোভনরকম বলিষ্ঠ, যেন সেই অতিশয় পুরুষজাতীয় জীব, যারা যোলোয় প'ড়েই জুতো-জামার মাপ-পেরোনো লম্বা

হ'য়ে বাপ-মাকে তাক লাগিয়ে দেয়। এঁর মুখখানাও ... প্রায় একটা কাঁঠালের সমান, ছাঁদটাও তেমনি লম্বার দিকে আর তাঁর গালের চওড়া জমিতে আগামী প্রত্যুষের দাড়ির বীজ- বোধহয় ঠাণ্ডায় রোমকূপ ফুলে উঠেছে ব'লেই—এখনই ... বুটি-বুটি নীল হ'য়ে ফুটেছে। দ্বিতীয় জন সুগঠিত সুশ্রী মানু সাজগোজেও দোরস্ত, টুপি ছড়ি দস্তানা সুদ্ধু শ্বেতাঙ্গবে টিপটপ। এঁর মুখখানা গোল ছাঁদের, নধর, গম্ভীর, গ রং ঠিক সেইরকম মসৃণ কালো, যাতে সুশ্রী পুরুষকে আ সুশ্রী দেখায়; আর মাথার চুল ঘন এবং কালো হ'লেও হ এক-একবার রুপোলি সুতো ঝিলিক দেয়। ঠোঁট চাপাও ভরাও না, তীক্ষ্ণ রেখায় পরিস্ফুট, যেন ঐ ঠোঁটের কম ক হুকুম ক'রে অভ্যেস। এঁকে যে দেখবে সে-ই বলবে যে, কখনো গলা চড়াতে হয় না, এঁর নিশ্চিত, সুশৃঙ্খল জীবনে নি নড়চড় হয় না কখনোই। এই আরাম, নিজেকে বেশ তোয় রাখার রুটিন, এই ওয়েটিংরুমের চেয়ারেই হাঁটুতে হাঁটু ব'সে থাকায় এঁর যে স্বাভাবিক কর্তৃত্বের ভাব, খানিকটা আভাস পাওয়া যায় তৃতীয় জনেও। ইনি মোটার দিকে—সেকেলে বাবুগোছের চেহারা, মাথার মধ্যিং টেড়ি-করা চুল, গাল দুটি লালচে—যারা খুব ফল খায় ত যেমন হয়—ঠোঁটের উপর পরিষ্কার গোঁফ দিব্যি মা কিন্তু চতুর্থ জন—তিনি যেন এই আরামের ঠিক উ ছোটো-খাটো মানুষ—বসেছেন একটু কোণের দিকে,

চেয়ারে ব'সে আর-একটায় পা তুলে দিয়েছেন—যদিও আর-একটা বিরাট ইজি-চেয়ার শূন্য প'ড়ে আছে, কিন্তু বসার ভাবটায় স্বাচ্ছন্দ্য নেই। বার-বার ন'ড়ে-চ'ড়ে কোনোরকমেই যেন আরাম পাচ্ছেন না, আর মাঝে-মাঝে চোখ বুজলেও কপালে থেকে-থেকে রেখা পড়ছে—যেন কী জরুরী কথা ভাবছেন, যেন ভাবনায় অস্থিরতাই এঁর অভ্যাস। হঠাৎ দেখলে এঁর বয়স খুব কম লাগে,—হয়তো চার জনের মধ্যে এঁরই বয়স সবচেয়ে কম, কিন্তু নাকের ঠিক তলাটিতে যখন আলো পড়ে তখন আর এঁকে যুবক ব'লে ভুল হয় না।

এই চার ভ্রাম্যমাণের এর আগেও পরস্পরে দেখা হয়েছে। তাজমহলের বাগানে, সেকেন্দ্রার সিঁড়িতে, তারপর আজ আগ্রা থেকে এক কামরাতেই এলেন। কিছু কথাও হয়েছে ট্রেনে ব'সে। তাতে বোঝা গেলো, বলিষ্ঠ পুরুষটি কনট্র্যাক্টর, দিল্লিতে এসেছিলেন ভারত সরকারের অর্ডার নিতে, ফিরতি-পথে আগ্রা, ইচ্ছে আছে কাশীতেও একবার থামবেন। দ্বিতীয় জন দিল্লিরই একজন পুরোনো, বিশ্বস্ত রাজপুরুষ, সম্প্রতি মিলিটারি বিভাগে একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত, এবং দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কাজেই আগ্রা থেকে এখন যাচ্ছেন এলাহাবাদ, তারপর লক্ষ্মৌ ক্যান্টনমেন্ট। তৃতীয় জন কলকাতার ডাক্তার—ডাক্তার নামজাদাদের মধ্যেই একজন—দিল্লিতে মেডিকেল কনফারেন্সে ডিপথেরিয়া বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে এখন রোগীদের তদারকে ফিরে যাচ্ছেন। আর চতুর্থ জন—তিনি

উত্তর ভারতে এসেছেন শুধুই বেড়াতে, দৃশ্য দেখতে, এখান থেকে সোজা কলকাতায় ফিরবেন, না, পথে কোথাও নামবেন, সে-বিষয়ে ঠিক মনস্থির নেই। তাঁর পেশা কী তাও ঠিক বোঝা গেলো না, বললেন বই লেখেন, কিন্তু বই লেখাটা ঠিক কাজের মধ্যে পড়ে কি? তবে মানুষটা যে বই ঘেঁষা তা বোঝা গেলো, কেননা, কথাবার্তা ফুরোবার পর যে মস্ত মোটা বইখানা তিনি খুলে ধরলেন, সেটি আকারে-প্রকারে—অন্য তিন জনেরই মনে হ'লো—ট্রেনে ব'সে পড়ার একেবারেই অযোগ্য, আদৌ পাঠযোগ্য কিনা তাও হয়তো সন্দেহ করা যায়।

টুণ্ডলায় এসে দুঃসংবাদ! আলিগড়ের কাছে মালগাড়ি ডিরেল্ড হয়েছে, সব গাড়ি বন্ধ। কতক্ষণ? তা লাইন ক্লিয়ার হ'তে চার-পাঁচ ঘণ্টা তো লাগবে। তার মানে, আজ রাত্রের মতো আশা নেই? মনে তো হয় না। রাজপুরুষের জরুরি কাজ, তিনি এরোপ্লেনের খবর নিলেন। হ্যাঁ, আগ্রায় ফিরে যাবার গাড়ি আছে, কিন্তু আগ্রায় ফিরে প্রথম প্লেন পাওয়া যাবে সকাল সাড়ে-ন'টায়। ডাক্তারটি যেন চেষ্টা করলেন বেশ দার্শনিকভাবে ব্যাপারটা মেনে নিতে, কিন্তু কনট্র্যাক্টর ঘন-ঘন নিশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগলেন, ওঃ, এই শীতে—! যদিও তাঁর দেহের আয়তন আর আচ্ছাদনের ঘনতা, দুটোই উত্তমরূপে শীতনিবারক। তবে, রোগা ভদ্রলোকটির সত্যি খুব শীত লাগছিলো, তিনি হাতে হাত ঘষলেন, একটু পায়চারি করলেন, তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে

অন্য তিন জনকে এই অনাবশ্যক খবরটা জানালেন যে, ওয়েটিংরুমে রাত কাটানো ছাড়া এখন আর উপায় নেই।

এই একটু আগেই মালপত্র নিয়ে বসেছেন এঁরা। কারো মুখেই কথা নেই, আপাতত তিন জনেই বোধহয় মনে-মনে এই দুরদৃষ্ট হজম করতে সচেষ্ট। এক-একটা মিনিটকেই কী লম্বা মনে হচ্ছে, আর শীতের এই লম্বা রাত!

ইজি-চেয়ারে ন'ড়ে-চ'ড়ে কনট্র্যাক্টর জিগেস করলেন, 'ক-টা বাজলো?' তাঁর নিজের হাতেও ঘড়ি ছিলো, কিন্তু আলস্যবোধেই হোক, কিংবা কথা বলার ছুতো ব'লেই হোক, তিনি অন্য দু-জনকেই জিগেস করলেন কথাটা।

জবাব দিলেন সরকারি চাকুরে: 'বারোটা পঁয়ত্রিশ।'

পঁয়ত্রিশ! যাক, ট্রেন থেকে নামার পরে আধ ঘণ্টা প্রায় কাটানো গেছে। কনট্র্যাক্টর আর-একটি প্রশ্ন খুঁজে পেলেন:

'শোবার ব্যবস্থা হবে নাকি?'

'এই মেঝেতে?'

তাতে কনট্র্যাক্টরের আপত্তি ছিলো না, কিন্তু অন্যের উন্নত রুচি অগত্যা মেনে নিলেন।

'এখানে রিটায়ারিং রুম নেই?'

'না।'

এই এক-কথার জবাবের পর কথাবার্তা এগোনো শক্ত, কিন্তু মোটা মানুষরা মিশুক হয়, আলাপী হয়, তাই ইজি-চেয়ারের গহ্বর থেকে আবার আওয়াজ উঠলো।

'আমরা তো তবু ব'সে-ট'সে যা-ই হোক—কিন্তু অন্য প্যাসেঞ্জারদের কী দুর্দশা!'

এর উত্তরে কোনো সমব্যথী মন্তব্য হ'লো না, কিন্তু, যেন এর উত্তরেই, ওয়েটিংরুমের টানা দরজা ফাঁক হ'লো, আর বাইরের হিম হাওয়ায় হঠাৎ ঘর ভ'রে গেলো। বোধহয় সেই-জন্যই চার জনেরই দরজার দিকে চোখ ফিরলো, যিনি মাথা হেলিয়ে চোখ বুজে ছিলেন, তাঁরও।

এই চার-জোড়া চোখের সামনে, দরজা খোলার কারণ যারা, তারাও থমকালো। দু-জন তারা। দরজাটা ফাঁক ক'রে ধ'রে যুবকটি দাঁড়ালো, সবটা তার দেখা গেলো না, আভাসে বোঝা গেলো, তার শীতে-ফাটা মুখ, গায়ের ব্রাউন রঙের বাড়িতে-বোনা পুল-ওভার, পরনে শস্তা দরের প্যাংলুন। আর মেয়েটি তার পাশে, প্রায় গা ঘেঁষে, আরো একটু আড়ালে। তাকে প্রায় দেখাই গেলো না—শুধু কিছু কালো চুল ঝিলিক দিলো, সিঁদুরের গর্বিত লাল, তরুণ মসৃণ গলা, গালের উপর চূর্ণালক। মাত্রই কয়েক সেকেণ্ড তারা সেখানে দাঁড়ালো, অস্ফুটে দু-একটা কথা বললো—কিন্তু ঐটুকুতেই ওয়েটিংরুমের বিশীর্ণ শীতে ঈষৎ যেন উষ্ণ হাওয়া দিলো, ঐটুকুতেই বোঝা গেলো তাদের নতুন বিয়ে হয়েছে—হয়তো দু-মাস, হয়তো এক বছর, কিন্তু পরস্পরের ভালোবাসায় এখন—এখনো—তারা আত্মহারা। ঐ-যে তারা একটুখানি দাঁড়ালো, নিচু-গলায় কী বললো কী বললো না, তারপর ফিরে গেলো, ওতেই বয়স্ক তিন জন পুরুষকে তারা

স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলো যে, এখনো তারা স্বর্গের অধিবাসী, একজনের আর-একজন থাকলে আর-কিছু চাই না, কিছু না, কাউকে না, কিছুই না।

দরজা আবার বন্ধ হ'লো, আবার থাকলো শুধু হৃদয়হীন, কৃপণ ওয়েটিংরুম, ট্রেনের অভাবে, আরামের অভাবে, ঘুমের অভাবে কাতর চার জন বয়স্ক পুরুষ।

মিশুক মোটা মানুষটি এবারেও প্রথম কথা বললেন।

'এঁরা ফিরে গেলেন যে ?'

'ফর্ষ্ট ক্লাশের প্যাসেঞ্জার ব'লে মনে তো হ'লো না,' জবাব দিলেন ডাক্তার।

'না, সে-জন্য না,' বললেন তৃতীয় জন, কপালে-রেখা-পড়া বইঘেঁষা মানুষটি, ওয়েটিংরুমে আসবার পরে এই তিনি প্রথম কথা বললেন। 'সে-জন্য না। ফিরে গেলো আমাদের দেখে।'

চাকুরের চিক্কণ মুখে হালকা হাসি ফুটলো। 'আই সী। হানিমুন। ইন লভ। ওয়েল···অন্তত আজ রাত্রিটা এদের দুঃখেই কাটবে।'

'না, দুঃখে না', আলগোছে জবাব দিলেন বই-পড়ুয়া। 'এরই মধ্যে একটু নিরিবিলি দেখে ব'সে থাকবে কোথাও—ভালোই থাকবে। এরা আর-কিছু চায় না, একটু নিরিবিলি চায়।'

'ও, রিয়েলি ! জীবনের এই একটা সময় !' কথার শেষে চাকুরের মুখ গম্ভীর হ'লো, যেন অন্য-কিছু ভাবতে-ভাবতে সিগারেটের টিন খুললেন।

কনট্র্যাক্টর ফোঁস ক'রে নিশ্বাস ফেললেন। 'ওঃ, ঠাণ্ডা!' একটু পরে, কোণের কুণ্ঠিত মানুষটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তা নিরিবিলি হোক, কিন্তু, ঠাণ্ডা তো লাগবে। এঁদের আসতে বললেই হ'তো।'

'বললেও আসতো না।'

ডাক্তার একটু হেসে বললেন, 'তাহ'লে—তাহ'লে আমরাই না-হয় নব দম্পতীর অনারে—'

'ওয়েটিংরুম ছেড়ে দেবো?' রোগা ভদ্রলোক চেয়ার থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এবার তাঁর একটা অন্য ছবি পাওয়া গেলো। ছোটো হালকা ছিপছিপে মানুষ, কিন্তু ভঙ্গিটা মজবুত কর্মঠ, চলাফেরায় পাখির মত দ্রুত, চোখের দৃষ্টি লাজুক, অশান্ত, ঠিক সোজাসুজি কারো দিকে তাকায় না। আর-কিছু না-ব'লে তিনি দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন, আবার ফিরে এসে হাতের কাছে যে-কোনো চেয়ারে ব'সে পড়লেন।

'মনে হচ্ছে, নব দম্পতীর বিষয়ে আমরা বড্ড বেশি ভাবছি,' টিপ্পনি কাটলেন দিল্লিওলা। 'আসুন—' সিগারেটের টিন এগিয়ে দিলেন।

'নো, থ্যাঙ্কস,' বললেন ডাক্তার। অন্য তিন জন সিগারেট ধরালেন, ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকলেন একটুক্ষণ।

দরজা আবার ফাঁক হ'তেই এঁরা চকিত হলেন। উর্দি-আঁটা বেয়ারা এসে জিগেস করলো, সাব-লোগের কিছু কি চাই? রিফ্রেশমেন্ট-রুম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে।

অন্যদের চোখের সম্মতি পেয়ে চাকুরেটি বললেন, 'কফি!'

আবার চুপচাপ। বাইরে এতক্ষণ সাড়াশব্দ ছিলো—লোকজনের চলাফেরা, হাঁকডাক—এবার প্যাসেঞ্জাররা সবাই বোধ হয় রাতের মতো গুছিয়ে বসলো, যেখানে হোক, যেমন হোক জায়গা ক'রে নিলো—সেই দু-জনও কোথাও একটু জায়গা পেয়েছে, এখানে আর আসবে না। এতক্ষণ কিছু বোঝা যায়নি, কিন্তু বাইরের গোলমাল থামতেই বড্ড বেশি চুপচাপ লাগলো চারদিক, এত বড়ো স্টেশনের পক্ষে অস্বাভাবিক চুপ। কিন্তু লাইন বন্ধ; আজ রাতে আর কোন গাড়ি আসবে না, ঘণ্টা বাজবে না; তার উপর যা শীত, কুলি, ফেরিওলা, পানবিড়ি, আপাতত সব ব্যস্ততাই ফুরোলো। আর এই ঘরের মধ্যে অনুজ্জ্বল আলোয় এই চার জন, পরস্পরের পরিচিতও নয়, সিগারেটের সূক্ষ্ম নীল ধোঁয়া তাঁদের সঙ্গী, যেন মনে হ'লো, বাইরের অন্ধকারে পৃথিবীটাই মুছে গেছে, একটা আরামহীন অভ্যর্থনাহীন ছোট্ট দ্বীপে তাঁরা আশ্রয় পেয়েছেন। পরস্পরকে তত আর অচেনা লাগল না, এমন কি, কোথায় যেন এইরকমও একটা অনুভূতি হ'লো যে, চার জনেই একই কথা ভাবছেন। ঐ-যে দু-জন—তরুণ-তরুণী—যারা মুহূর্তের জন্য দরজার ধারে ঝিলিক দিয়ে চ'লে গেলো, ঐটুকুতেই তারা কিছু রেখে গেছে—যেন যৌবনের পাখি উড়ে যেতে-যেতে পালক ঝরিয়ে দিলো—কোনো-একটু চিহ্ন, কোনো তাপ, কোনো সুখ, দুঃখ, কম্পন, যা এখনো থামছে না, যা নিয়ে এই চার জন, কথা যদি নাও বলেন,

অন্তত মনে-মনে যা ভাবতে পারবেন, তাতেও হয়তো এই বিশ্রী রাতটা কোনোরকমে কাটতে পারবে।

হঠাৎ ডাক্তারটি বললেন, 'আমাদের বোধহয় অভদ্রতাই হ'লো।'

'এখনো দম্পতীর কথাই ভাবছেন?' দিল্লিওলা হাসলেন, কিন্তু তাঁর কথাতেই প্রমাণ হ'লো যে, তিনিও তাদের ভোলেননি।

'ভাবছিলাম—অন্য কথা ভাবছিলাম। ভাবছিলাম এমন দিন এদের জীবনে ক-দিন থাকবে।'

এবার দিল্লিওলা ছোট্ট আওয়াজ ক'রে হাসলেন। 'সেটা কি একটা ভাববার বিষয়? সেটা কি আমরা সকলে জানি না?'

'পরে আমরা সকলেই জানি,' কথা বললেন অন্য জন, শীর্ণ মুখের ছোট্ট মানুষটি, 'কিন্তু তখনকার মতো কেউ জানি না। ধরুন, ঐ দু-জন এখন কি ভাবতে পারে যে, এর মেয়াদ কত অল্প দিনের? তারা কি কখনো ভাবতে পারে যে, ঠিক এইভাবেই আর বেশি দিন তাদের জীবন কাটবে না? এই আশ্চর্য ফাঁকির এটাই তো সবচেয়ে আশ্চর্য।'

'আশ্চর্য ফাঁকি। বাঃ, বেশ বলেছেন কথাটা!' কনট্র্যাক্টর মাথা নেড়ে অনুমোদন জানালেন।

কফি এলো।

'তাহ'লে কি সবটাই ফাঁকি?' কনট্র্যাক্টরের মস্ত মুখে যেন দুশ্চিন্তার ছায়া নামলো।

'অন্তত এই কফিটা একেবারেই ফাঁকি না। দিব্যি ধোঁয়া

উঠছে। আপনার চিনি ?' ব'লে ছিমছাম ডাক্তার কফি ঢালতে ব্যস্ত হলেন।

মস্ত মোটা মানুষটি—মনে হ'লো—মনের কৌতূহলে শরীরের আলস্য ভুললেন। ইজি-চেয়ার ছেড়ে অন্য দু-জনের কাছাকাছি চেয়ার টেনে বসলেন, ঠাণ্ডা টেবিলে হাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে বললেন, 'তাহ'লে কি সবটাই ফাঁকি ? কিছুটা থাকে না ? আপনি তো সাহিত্যিক—আপনি বলুন তো ?'

সাহিত্যিক ব'লে যাঁকে সম্মান করা হ'লো, তিনি এই সম্ভাষণে কুণ্ঠিত হলেন, কিন্তু তাই ব'লে জবাব দিতে দেরি করলেন না।

'স্মৃতি থাকে। শেষ পর্যন্ত শুধু স্মৃতিই থাকে, আর-কিছুই থাকে না।'

'স্মৃতির কী মূল্য ?'

'কিচ্ছু না!' দিল্লিওলা প্রফুল্ল স্বরে ঘোষণা করলেন। 'মিছি-মিছি কাজের ক্ষতি, সময় নষ্ট, ব'সে-ব'সে মন-খারাপ করা। আসুন—আপাতত কফিটা খাওয়া যাক।'

কনট্র্যাক্টর তবু আবার একটা প্রশ্ন করলেন, 'যে-সুখ এখন আর নেই, তার স্মৃতি সুখের, না দুঃখের ?'

দিল্লিওলার ঠোঁটের কোণে ঠাট্টার হাসি ফুটলো। 'ও-সব ভেবে লাভ নেই, তবে একটা গল্প শোনান তো সময় কাটে।'

'গল্প ! গল্প কিসের ?'

'আই মীন—আচ্ছা, আমরা এখানে চার জনেই বয়স্ক পুরুষ-

মানুষ, মহিলাও কেউ উপস্থিত নেই, তাই মন খুলে কথা বললে দোষ হয় না।'

'আপনি বলছেন কী ?' মোটা কনট্র্যাক্টর একটু যেন ভীত হলেন।

'ইনি বলছেন,' ডাক্তার বুঝিয়ে দিলেন, 'যে এইরকম দিন —ঐ দু-জনের মতো দিন আমাদেরও জীবনে একদিন ছিলো—'

'আমার না !' কনট্র্যাক্টর আপত্তি জানালেন, এবং সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর দাড়ির ছায়া-পড়া প্রশস্ত গাল বিসদৃশ লজ্জায় হঠাৎ একটু লাল হ'লো।

'আপনারও,' বললেন সাহিত্যিক, 'এমন কেউ নেই যার কখনো কাউকে ভালো লাগেনি। তারপর কী হ'লো সেটা কিছু কথা নয়, ঐ ভালোলাগাটুকুই দামি। হয়তো তার স্মৃতিরও কিছু মূল্য আছে। তেমনি কোনো স্মৃতি—'

'আমার নেই !' কনট্র্যাক্টর সজোরে হাত নেড়ে প্রতিবাদ করলেন। 'আপনারা বলুন, আমি শুনি।'

'বেশ, আমরাও বলবো,' ডাক্তার ভারিক্কি-গলায় বললেন, 'কিন্তু আপনাকেও বলতে হবে। আজ তো আর ঘুম-টুমের আশা নেই, গল্প ক'রেই রাতটা কাটানো যাক। আরম্ভ করুন।'

'আমাকে বলছেন ?' কফির পেয়ালা তুলতে গিয়ে কনট্র্যাক্টর থামলেন। 'আমি দেখুন, ব্যবসা করি, ব্যবসা ছাড়া কিছুই বুঝি না, আমার ও-সব—'

'হ্যাঁ, আপনারও আছে—' খুব নিশ্চিন্তভাবে সাহিত্যিকটি বললেন।

কনট্র্যাক্টর নিচু-মাথায় চুপ ক'রে থাকলেন একটু। তারপর বললেন, 'আমার কোনো কথা নেই, তবে অন্য-একজনের কথা আমি জানি—আমার এক বন্ধু—'

'বেশ, তার কথাই বলুন।'

কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে কনট্র্যাক্টর আরম্ভ করলেন।

মাখনলালের দুঃখের কাহিনী

মনে করুন তার নাম মাখনলাল। নাম শুনেই বুঝতে পারছেন সে খুবই মোটামুটি আটপৌরে-গোছের মানুষ, কিন্তু বাড়িতে তার খাতির খুব। তার কারণ সে তার বংশের প্রথম বি. এ.। তার ঠাকুরদার সাত ছেলে, সাত ছেলের বত্রিশটি, আর সেই বত্রিশের যে আরো কত কে জানে—এখনো কি তার শেষ হয়েছে! কিন্তু এতগুলি লম্বা-চওড়া পুরুষজাতীয় জীবের মধ্যে একজনও ম্যাট্রিকের চৌকাঠ পেরোতে পারেনি, কেউ-বা সেখানেই ঠোকর খেয়েছে। এ নিয়ে হিরণ্ময়ীর—অর্থাৎ মাখন-লালের মা-র মনে আক্ষেপের অন্ত ছিলো না, কথায়-কথায় এ-নিয়ে স্বামীকে এমন খোঁটা দিতেন যে, রাঘববাবুর মুখে আর রা বেরোতো না। তাঁর—মানে হিরণ্ময়ীর—দুই দাদাই বি. এ. পাশ, নিজে তিনি 'নীলকামারি গার্লস্ হাই স্কুলে' ক্লাশ নাইন অবধি পড়েছিলেন। তাই তাঁর প্রথম পুত্র, এবং প্রথম সন্তান,

মাখনলাল যেদিন জন্মালো, সেদিন থেকেই তাঁর প্রতিজ্ঞা যে, ছেলেকে বি. এ. পাশ করানোই চাই।

এ-প্রতিজ্ঞা পালন করা সহজ হয়নি। বাড়ির হালচাল শাবেকি-জমিদারির মৌতাতে ভরা। কাজ ক'রে খেতে হবে এ-কথা অনেকদিন কারো মনেই হয়নি, তাই সরস্বতীর গোলদিঘি-মার্কা পদ্ম কুড়োতেও কারো গরজ ছিলো না। আজ অবস্থা প'ড়ে গেছে, কিন্তু সেকেলে চালটুকু আছে; এখনো বাড়ির কর্তারা বেলা দুটোয় গড়িমসি ক'রে স্নান ক'রে, বাটিবেষ্টিত সুবৃহৎ থালায় ভোজন করেন, তারপর পাশ-বালিশটিকে আলিঙ্গন ক'রে পরম প্রশান্ত চিত্তে নিদ্রা যান। এই দিবানিদ্রা তাঁদের বংশগত বৈশিষ্ট্য, দেউলে হ'তে-হ'তেও এটা তাঁরা ছাড়েননি। অর্থাভাবে কষ্ট হয় বইকি, কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের কষ্ট যে ততোধিক।

রাঘববাবুরও ঐভাবেই দিন কাটছিলো—ঐভাবেই কাটতো—যদি-না হিরণ্ময়ী পণ করতেন, ছেলেকে পাশ করানো চাই। দেশে প'ড়ে থাকলে হবে না, হ'তেই পারে না। তাই মাখনলাল যেবার গ্রামের স্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করলো, স্বামীকে প্রচণ্ড তাড়া দিয়ে সেবারই তিনি চ'লে এলেন ছেলেপুলে সুদ্ধু কলকাতায়। রাজি হওয়াই সবচেয়ে সোজা ব'লে গোলগাল রাঘববাবু স্ত্রীর কথায় রাজি হ'লেন, আলস্যের বনেদি অভ্যাসটাও আস্তে-আস্তে তাঁকে ছাড়তে হ'লো। কলকাতায় আসার অল্পদিন পরেই তিনি পুঁজিপাটা ভাঙিয়ে ছোটো একটি

দোকান দিলেন ভবানীপুরে। বলা বাহুল্য, এটাও স্ত্রীর পরামর্শে। হিরণ্ময়ী বুঝেছিলেন যে, জমিদারির স্মৃতি ভাঙিয়ে ভাত-কাপড়ও আর বেশি দিন জুটবে না। মাথার বুদ্ধি আর গায়ের গয়না খরচ ক'রে তিনি স্বামীকে দোকান ক'রে দিলেন।

কাঠের দোকান। ছুতোরের কাজে রাঘববাবুর শখ ছিলো, নিজের হাতে চেয়ার-টেবিলও বানিয়েছিলেন। তাই, অনিচ্ছায় আরম্ভ করলেও, ক্রমে-ক্রমে কাজে বেশ নেশাই লাগলো তাঁর। দুপুরের ঘুমটুকু ছাড়লেন না, কিন্তু সেই দু-তিন ঘণ্টা বাদ দিয়ে প্রায় সারাদিনই তিনি দোকানে। হয়তো সেইজন্যই লক্ষ্মী তাঁকে কৃপা করলেন, এবং লক্ষ্মীর কৃপায় আরো তাঁর উৎসাহ বাড়লো। বছর-দুয়েকের মধ্যে তাঁর ছোট্ট দোকানে 'দি সাউথ ক্যালকাটা ফারনিশিং হাউসে'র পত্তন হ'লো।

রাঘববাবুর ইচ্ছে ছিলো, মাখনলাল প্রথম থেকেই দোকানে বসুক, কাজকর্ম শিখুক, কাঠের গন্ধ, স্পর্শ, বর্ণের সঙ্গে পরিচিত হোক। কারবারে উন্নতির সঙ্গে-সঙ্গে কাজও যখন বেড়ে চললো, তখন বড়ো ছেলের সাহায্য পেতে আরো তিনি ব্যস্ত হলেন। আই. এ. তো হ'লো—আর কী দরকার—হবেই-বা কী পাশ ক'রে—এদিকে কারবার উঠতির মুখে, ঠিক এই সময়টায় ভাগ্যের টুঁটি চেপে না-ধরলে শেষটায় মা ফসকে যায়। কিন্তু বৃথা যুক্তি! যদি সর্বস্ব যায়, তবু মাখনলালের বি. এ. পাশ করাই চাই।

সেই মাখনলালের সেই বি. এ. পরীক্ষায় পাশের খবর যেদিন

পাওয়া গেলো, সেদিন হিরণ্ময়ীর আনন্দ আপনারা কল্পনা ক'রে নিন। তাঁর একুশ বছরের স্বপ্ন এতদিনে সার্থক! এত খুশি হলেন যে, খুশির ঝোঁকে তিনি একটা অদ্ভুত প্রস্তাব করলেন—বললেন, ছেলের এবার বিয়ে দেবো।

অদ্ভুত না? বি. এ. পাশ করলেই বিয়ের যোগ্যতা হয় এ-কথা কি আজকাল কেউ ভাবে? মাত্র বি. এ.-পাশ-করা ছেলে—সে তো ছেলেমানুষ! তার আবার বিয়ে!

কিন্তু হিরণ্ময়ীর কাছে এতে একেবারেই কিছু অদ্ভুত ছিলো না। প্রথমত, এটাই ওদের পারিবারিক প্রথা—ওর বাপ-খুড়োরা কেউ আঠারো পেরোয়নি। শিক্ষায় আধুনিক হ'য়ে, বিয়ের ব্যাপারে শাবেকী হ'তে দোষ কি—সংসার সচ্ছল, ঘরে বৌ এলেই এখন ভরা-সুখ। আর ছেলে কি আজ-কালকার চশমা-চোখো পুঁচকেদের মতো—একবার চেহারাখানা গ্যাখো না!

হ্যাঁ—চেহারাখানা তার দেখবার মতো—সে-কথা সত্যি। মাখনলালকে আমি ভালোই চিনি—চিনতাম—একুশ বছরেই যেন বত্রিশ বছরের জবরদস্ত জোয়ান সে। বড়ো-বড়ো দাঁত, বক্ষস্থল ঘনরোমশ, পায়ের প্রকাণ্ড জুতো দুটো এমনিতে প'ড়ে থাকলে দেখে প্রায় তাক লাগে। তিন ছেলের বাপ ব'লে স্বচ্ছন্দে যাকে চালানো যায়, বিয়ে না-করলে তাকে আর মানাবে কেন?

পাত্রীও হাতের কাছেই জুটে গেলো। পাশের বাড়িতে থাকেন সুভদ্রবাবু, মনে-মনে তাঁর মেয়েকেই হিরণ্ময়ীর প্রথম থেকে পছন্দ। কারণ, রূপ? বাপের টাকা? কোনোটাই না।

সুভদ্রবাবু আধা-গরীব প্রোফেসর, আর মেয়েটি—আমি মাখন-লালের কাছেই শুনেছিলাম সব—যাকে সুন্দরী বলে ঠিক তেমন-কিছু নয়। কিন্তু, বিদ্যে! বাপ বিদ্বান, আর মালতী—মেয়েটির নাম মালতী—সে নিজেই কি কম! ম্যাট্রিকুলেশনে তিন তারা পেয়ে এখন কলেজে পড়ছে, খেতে ব'সেও নাকি বই পড়ে সে। আর বইয়ের কি ছড়াছড়ি বাড়িতে—বাসরে! —এমন কি আর কোথাও দেখা যায়?

বই দেখে মেয়ে পছন্দ একটু হয়তো নতুন শোনায়, কিন্তু আপনারা এতক্ষণে তো বুঝেছেন যে, ঠিক ওখানটাতেই হিরণ্ময়ীর দুর্বলতা। একটুও অতিরঞ্জন না-ক'রে বলা যায় যে, একসঙ্গে অত বই তিন কুলে কোথাও তিনি ছাখেননি। সবচেয়ে কম দেখেছেন শ্বশুরবাড়িতে, সেখানে ও-সবের পাটই নেই। মাখনটাও তা-ই, পাশ করুক আর যা-ই করুক, এমনিতে একটা বইয়ের কখনো পাতা ওল্টায়? না—বংশের ছাঁচই এদের অদ্ভুত।

অতএব, বংশের ধারা বদলাতে হ'লে, বিদ্বান-বাড়ির মেয়ে চাই—এই হ'লো হিরণ্ময়ীর মনের কথাটা। অর্থাৎ, যেমন তিনি কাটের ছুতো ধ'রে লক্ষ্মীকে ডেকেছিলেন, তেমনি এখন পুত্রবধূর ফাঁদ পেতে সরস্বতীকে ধরতে গেলেন। জাত-গোত্র সব মিলে যাচ্ছে—এই শ্রাবণেই হ'য়ে যাক না, নয়তো সেই অঘ্রাণ আবার কত দূর!

স্বামীর সামনে পঞ্চ-ব্যঞ্জন সাজিয়ে কথাটা একদিন

পাড়লেন তিনি। রাঘববাবুর ইচ্ছেটা অন্য রকম—মোটা রকম কিছু হাতে পেলে ব্যবসাটি জাঁকিয়ে তোলেন, কিন্তু হিরণ্ময়ী উড়িয়েই দিলেন সে-কথা। বললেন, 'টাকা তোমার কপালে থাকলে এমনিতেই হবে—হাত পাতবে কেন?'

'না, না, হাত পাতার কথা না—তবে এই···সেদিন অবিনাশবাবুই বলছিলেন···'

'কে অবিনাশবাবু?'

'আমার পাশেই তাঁর দোকান।'

'মদের দোকান? ছি! শুঁড়ির মেয়ে!'

'শুঁড়ি তো নয়—চব্বিশ পরগনার কায়েৎ। একটু গরজও আছে মনে হ'লো—তুমি না-হয় মেয়েটিকে একবার—হ'লে বোধহয় সব দিক থেকেই—'

'থামো তো বাপু। আমার বুদ্ধিতেই এতদূর এগোলে, এখন আর বাগড়া দিয়ো না।'

'ছাখো, যা ভালো বোঝো। কিন্তু প্রোফেসরের জামাই হ'য়ে দোকানদারিতে মন বসবে তো ছেলের?'

'তার জন্য ভাবছো? মাখন কি আমার তেমন ছেলে—ছাখো না, দু-দিন বাদে তোমার এই সংসারই ঘাড়ে নেবে সে!' ব'লে হিরণ্ময়ী ছেলের দিকে তাকালেন। 'কী রে, তোর মত আছে তো?'

বাপের পাশে ব'সে মাখনলালও খাচ্ছিলো, মা-র প্রশ্ন শুনে তার খাওয়া থেমে গেলো। কিছু বললো না, শুধু মুখমণ্ডল

অতিশয় গম্ভীর ক'রে মতনেত্রে থালার গায়ে আঁচড় কাটলো! বোঝা গেলো—চোখেও দেখা গেলো যে—আস্ত সংসারটা তুলে নেবার মতোই চওড়া যার কাঁধ, একটি কলেজে-পড়া ছিপছিপে মেয়ের ভার বইতে তার খুব অসুবিধে হবে না।

আপনারা ভাবছেন এর কোনো ইতিহাস আছে? হ্যাঁ, আছে একটু। প্রকৃতি দেবীর কারসাজিতে ভুল হয় না, অত বড়ো প্রকাণ্ড যে-মাখনলাল, তারও বলিষ্ঠ রোমশ-বুকের মধ্যে কোথায় একটি ফুল ফুটেছিলো।

কথাটা এই যে, মালতীর সঙ্গে রোজই তার দেখা হয়। দেখা হয় বলাটা ভুল হ'লো, মালতীকে সে রোজই প্রায় দেখতে পায়। ওদের ভিতরের দিকের বারান্দাটা চোখে পড়ে তার ঘর থেকে; এমন দিন বড়ো যায় না যেদিন অন্তত দু-একবার শাড়ি-পরা হালকা একটু হাওয়া মাখনলালকে আনমনা ক'রে না দেয়। সে অতীব ভদ্রভাবে—কি নিজেই লজ্জা পেয়ে—তখনই চোখ ফেরায়, কিন্তু ফিরিয়ে নিতে-নিতেও একটুখানি দেখেই ফেলে। কখনো মালতী ঐ বারান্দায় বেতের চেয়ার টেনে আনে—একটু দূরেই যে কোনো-একজন মানুষ তাকে লক্ষ্য করছে, অন্তত করতে পারে, সে-বিষয়ে কোনো চেতনাই নেই তার—ব'সে-ব'সে পড়ে, হাসে, চ্যাঁচায়, গল্প করে, ভাই-বোনের সঙ্গে গান করে গুনগুন। কোনো মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকতে নেই এ-কথা কে না জানে—কিন্তু মহিলাটি নিজেই যদি চোখের সামনে এসে ব'সে থাকেন তাহ'লে চোখ দুটোকে উপড়ে

ফেলা যায় না তো!—মাখনলাল অনেক সময় নিজেও জানেনি সে কী দেখছে, কিন্তু যেই মালতী বারান্দা ছেড়ে ঘরে গেছে, তখনই বুঝেছে এতক্ষণ তার চোখ কেন চঞ্চল ছিলো। শুধু কি চোখ? প্রশস্ত বুকের তলায় হৃৎপিণ্ডও কি দ্রুত হয় নি?

এইটুকুই ইতিহাস। কিছুই নয়, কিন্তু খুব কি কম? মাখনলাল—আপনারা ঠিক ধরেছেন—একটু কম-বুদ্ধির মানুষ, শহরের তুখোড় যুবকদের মতো কম বয়সেই অনেক-কিছু সে জেনে ফেলেনি। ঐ একটু চোখে-দেখার পুঁজি নিয়েই তার সুখ, এমন কি, মনে-মনে ভাবটা তার এই, যেন সত্যিই মালতী তার চেনা। এদিকে মালতীর বিশ্বজগতে মাখনলাল নামক একজন প্রকাণ্ড প্রতিবেশী পুরুষের যে অস্তিত্বই নেই এ-কথা সে কি জানে? ভাবে কখনো? হয়তো জানে, কিংবা জানে না, কিন্তু ভাবতে হ'লে মালতীকে খুব কাছের মানুষ ছাড়া আর-কিছু ভাবতে পারে না। তাই মা-র এই প্রস্তাবে সে তেমন অবাক হ'লো না, অত্যন্ত বেশি সুখীও হ'লো না, যেন প্রায় জানা কথা ব'লেই মেনে নিলো। পাশের বাড়ির বারান্দাবর্তিনী যখন তার পার্শ্ববর্তিনী হবে, তখন তার সঙ্গে কী-রকম ক'রে চলবে, কী-রকম কথা বলবে, তারও একটা খশড়া রাত্রে শুয়ে-শুয়ে মনে-মনে তৈরি ক'রে ফেললো সে। প্রথম কথা জিগেস করবে এই যে, তোমাদের বারান্দা থেকে আমাকে কি কখনো দেখেছো? কী বলবে তখন?

এর দু-একদিন পরেই হিরণ্ময়ী কাজে নামলেন। দুপুর-বেলা খাওয়ার পরে লালপেড়ে পাটভাঙা শাড়ি পরলেন, বেশ বড়ো ক'রে সিঁদুরের ফোঁটা দিলেন কপালে, আর একটি পান মুখে দিয়ে প্রোফেসরের বাড়িতে রওনা হলেন। ফিরে যখন এলেন তখন তাঁর মুখের হাসি মুছে গেছে, পান-খাওয়া ঠোঁটেও তেমন আর প্রসন্নতা নেই।

রাঘববাবু তখন বাড়িতে, সেটা তাঁর দিবানিদ্রার সময়। কিন্তু সেদিন তাঁর পুরোনো অভ্যাসে গুরুতর ব্যাঘাত ঘটলো।

পাশের ঘরে ব'সে মাখনলাল শুনলো তার মা-র প্রায় অবিরাম গলা, মাঝে-মাঝে বাবার মৃদু আওয়াজ—কিন্তু মাঝে-মাঝে মা যখন গলা চড়ালেন, তখন কথাগুলিও তার কানে এলো।

'কী বললে? দোকানদার! দোকানদারের ছেলে! তা ওদেরই-বা এত দেমাক কিসের শুনি? প্রোফেসর? কিন্তু মাইনে পায় কত? আমাদের সেই কত বড়ো বাড়ি, বড়ো-বড়ো নৌকো-বোঝাই ধান, পূজোর সময় সে কী তুমুল···ও-রকম দেখেছে ওরা কখনো?···না, কথাটা কানেই তুললো না! "বিয়ের কথা আমরা ভাবছি না এখনো! মেয়ে আমাদের ছেলেমানুষ!"··· ছেলেমানুষ! কত আর ধিঙ্গি হবে বলো তো?···পছন্দ? আমার ছেলে কি কারো চাইতে কম? সে কি বি. এ. পাশ করেনি, না কি তার চরিত্র ভালো না, না কি তার খাওয়া-পরার অভাব? কোথায় পাবে ওর চাইতে সুপাত্র? ঐ তো কালো

মেয়ে, কোন রাজপুত্তুর বরণ করবে তাকে? কত ভাগ্য ওদের যে আমি······ওঃ!'

ঘুরে-ফিরে এই একই কথা বার-বার। রাঘববাবু ততক্ষণে বোধহয় ঘুমিয়েই পড়লেন, মাখনলালও আর শোনবার চেষ্টা করলো না, কিন্তু মা-র গলার আওয়াজ পেলো আরো খানিকক্ষণ।

এর পরে কয়েকটা দিন অপমানের জ্বালায় ছটফট করলেন হিরণ্ময়ী। অপমানের ডবল কারণ এই যে, বৌ ঘরে আনবার গরজ তাঁর যত, মালতীকেই বৌ করার ইচ্ছে তার বেশি। 'বললাম, মেয়েকে পড়াতে চান আমরাই পড়াবো, বি. এ. পাশ বৌ হ'লে আমাদেরই সুখের কথা, আমাদের দাবি-দাওয়া কিছু নেই তাও বললাম, তবু কিনা কানেই তুললো না কথাটা! বাবা রে বাবা, গরবে যেন ন'ড়ে বসে না! কিন্তু কেন—কারণটা শুনতে পাই কি? টেবিল সাজিয়ে ব'সে পুঁই-চিংড়ির চচ্চড়ি খায় ব'লে?'

'আঃ! থামো, মা!' মাখনলাল মৃদু স্বরে প্রতিবাদ করলো। 'এই গায়ে-গা-লাগা বাড়ি—কেউ শুনে-টুনে ফেললে—'

'শুনুক না!' হিরণ্ময়ী প্রোফেসরের বারান্দার দিকে স'রে এসে আর-এক পরদা গলা চড়ালেন। 'আমি কি ওদের ডরাই, না আবার ওদের সাধতে যাচ্ছি! অঃ, তোর মতো যুগ্যি ছেলের মা আমি—আমার আবার ভাবনা! দেখবি, মাখন দেখবি, এমন একদিন হবে যে, তোর দিকে—হ্যাঁ, তোর দিকে তাকিয়ে বুক জ্ব'লে যাবে ওদের। এই আমি ব'লে দিলাম।'

এইরকম ঢেউ উঠলো আরো ক-দিন, তারপর মাখনলালের বিয়ের কথাটা আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো। মদের দোকানের অবিনাশবাবু শ্রাবণেই তাঁর মেয়ে পার করলেন, আরো অনেক শাদা-সিঁথি সিঁদুর ছুঁলো, কিন্তু শ্রীমাখনলাল ঘোষ, বি. এ. যে কিনা স্ত্রীর ভার গ্রহণ ও বহন করার বিশেষভাবে যোগ্য, তার বিয়ের কথাই আর উঠলো না। নিশ্চয়ই সে-বছর বাংলা দেশে কুমারী কন্যার অভাব ছিলো না, কিন্তু হিরণ্ময়ী মুখে অনেক ব'লে-ট'লেও শেষ পর্যন্ত তেমন উদ্যোগী হলেন না। কেন? তক্ষুনি ছেলের খুব ভালো বৌ ঘরে এনে প্রোফেসরকে বাড়ি-সুদ্ধু তাক লাগাতে পারতেন তো? তা-ই তো তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিলো? নিশ্চয়ই—কিন্তু কেন হিরণ্ময়ীর ব্যবহার এখানে উল্টো হ'লো, আমি তা ঠিক বলতে পারবো না। তিনি কি সত্যি-সত্যি ভাবছিলেন যে, ঐ বিদ্বান-বাড়ির উপর আশ্চর্য কোনো প্রতিশোধ নিতে পারবেন? তা যদি হ'য়ে থাকে, অন্তত বাস্তবে তার লক্ষণ কিছু ছিলো না। মাস কাটলো, দু-মাস কাটলো, প্রোফেসরের বৌ ভদ্রতা ক'রেও—এমনি প্রতিবেশী বলেও—একদিন এলেন না, কোনোদিনই আসেন না তিনি, যদিও হিরণ্ময়ী মাঝে-মাঝে আগে যেতেন। সেই বারান্দা তেমনি নির্বিকার, তেমনি সেখানে হাসির হাওয়া, আঁচলের ঝলক, কিন্তু মাখনলাল সেদিকে আর তাকায় না।

আপনারা ভাবছেন মনের দুঃখে? না, মাখনলালের একটা

গুণ এই যে, অত দুঃখ-টুঃখ বোঝে না। আসল কথা, তার এখন সময় নেই। সকালে উঠে এক বাটি দই-চিঁড়ে খেয়ে দোকানে চ'লে যায়, দুপুরে খেতে আসে একবার, একটু জিরিয়েই আবার বেরোয় আর ফেরে সেই রাত্রে। বাপের অর্ধেক কাজই সে তার চওড়া কাঁধে তুলে নিয়েছে—বলতে গেলে সবটাই; যেমন তার উৎসাহ, তেমনি উদ্যম, আর মস্ত মোটা মাথার মধ্যে মগজের যদি অভাব থাকে, স্রেফ পরিশ্রমেই তা পুষিয়ে যায়। তাকে তো দেখেছি সে-সময়ে—ঘোড়ার মতো খাটছে সারাদিন, চরকির মতো ঘুরছে সারা শহর, এর মধ্যে বিদ্বান-বাপের বিদুষী কন্যার কথা মনে করার সময় তার কোথায়?

না, সময় নেই। শুধু যেতে-আসতে প্রোফেসরের বাড়ির সামনের পথটুকু তার কেমন অস্বস্তি লাগে। হঠাৎ মনে হয় সে বুঝি বড্ড লম্বা, বড্ড মোটা, কাপড়টা বুঝি ময়লা, চলনটা বিশ্রী। একতলায় রাস্তার ধারেই ওদের বসবার ঘর; মাখনলাল প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও একবার না-তাকিয়ে পারে না। কিছু দেখতে পায়? কিছু না, পরদার ফাঁকে ঝাপসা শুধু আভাস। কিন্তু হঠাৎ কোনো-একদিন পরদা হয়তো স'রে যায়, তখন চোখে পড়ে—চোখে পড়ে অচেনা এক অন্য জগৎ। মাখনলালের জন্ম-চেনা বাড়িতে সবই যেন সব সময় অগোছালো, পরিষ্কারটাও বড়ো জোর আধ-ময়লা;—আর এখানে সাজানো ঘর, সুন্দর অভ্যর্থনা, দেয়ালে ছবি, সারি-সারি বই, অন্য জগৎ। কখনো হাসি, টুকরো কথা, একটু হয়তো শাড়ির ঝিলিক। কোনোদিন

এমনও হয় যে, মাখনলালের পা যেন আর চলে না, প্রকাণ্ড পেশীবহুল বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড দ্রুত হয় একটু; হঠাৎ মনে হয় ঐ কাঠের দোকান, আর ঐ অফুরন্ত হাতে হাতে-ঘোরা ছাপানো কাগজ—তা কাঠের মতোই শুকনো, কাগজের মতোই রক্তহীন। কিন্তু যখনই এ রকম মনে হয় তখনই ডবল-কদমে পা চালায় সে, ছুটে গিয়ে ট্রাম ধরে, তারপর কাজের ভিড়ে সব ভুলে যায়।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরের মাঝামাঝি তখন, সাপ্লাই-আপিসের অন্তঃপুরে টাকার ভিয়েন বসেছে, গন্ধ দিচ্ছে হাওয়ায়। অন্য অনেকের মতো মাখনলালও সে-মুখো হ'লো—একটু ভয়ে-ভয়েই, কিন্তু হাতে-হাতে ফল যা পেলো, তা নিশ্চয়ই তার আশাতীত। বয়সের তুলনায় তাকে বড়ো দেখায় সেটা হয়তো সুবিধে ছিলো, হয়তো তার বলবান চেহারায় বিশ্বাস জাগে, কিংবা তার লেগে থাকার শক্তি কিছু বেশি;—কারণটা যা-ই হোক, ঘুরে-ঘুরে একে-ওকে ধ'রে বেশ কিছু কাজ তার চটপট জুটে গেলো। তারপর শীতকালে যেই জাপান যুদ্ধে নামলো, অমনি যেন—কিন্তু তখনকার কথা আপনারা তো জানেন।

হ্যাঁ, আশ্চর্য সময় গেছে তখন। কলকাতায় লোক নেই, কলকাতায় লোক ধরে না, কলকাতায় বোমা, কলকাতায় ফুটপাতে ধুঁকে-ধুঁকে কত হাজার মরলো। দু-পয়সার জিনিশ বারো আনা, চাল, চিনি, কয়লা, নুন কিচ্ছু নেই, দেশ ভ'রে খাকি, চাকরি, আর টাকা-টাকা শস্তা নোটের ছড়াছড়ি। ভাবতে এখন আমাদেরই অবাক লাগে, কিন্তু এরই মধ্যে

মাখনলালও কম আশ্চর্য না। একেই হয়তো কপাল বলে—না কি তার মা-র আশীর্বাদই ফললো?—যেখানে সে হাত দেয় সেখান থেকেই টাকার যেন ঢল নামে। এক-একবার একসঙ্গে প্রায় .কুলির বোঝা নোট পায়, পকেটে ধরে না, খবর-কাগজে বাণ্ডিল বেঁধে ব্যাঙ্কে ব'য়ে আনতে হয়। রোজ জমা দিচ্ছে, রোজ মোটা-মোটা চেক কাটছে, আর দিন, সপ্তাহ, মাস, বছর কেমন ক'রে কেটে যাচ্ছে। কখন দিন আর কখন রাত্রি সে-কথাই প্রায় ভুলতে বসেছিলো, হঠাৎ একদিন দম নিয়ে দেখলো সে লক্ষপতি হয়েছে। সত্যি।

যেখানে ছিলো গলির মধ্যে ছোট্ট দোকান, সেখানে এখন মস্ত কারখানা, বড়ো রাস্তায় শো-রুম, একশো লোকের রুটির মালিক মাখনলাল। তার ছোটো দু-ভাই, তারাও কলেজ ছেড়ে কাজে লাগলো—এবার আর হিরণ্ময়ী আপত্তি করলেন না। আর রাঘববাবু? তাঁর এখন পেনশন—পেনশন অন্ ফুল্ পে! ছেলের যোগ্যতার সুযোগে তাঁর জমিদারি-মেজাজে উজান বইলো; সকালবেলা বিরাট বাজার নিয়ে বাড়ি ফেরেন, তারপর রান্নাঘরের চৌকাঠে ব'সে স্ত্রীর সঙ্গে খোশগল্প, গড়িমসি-বেলায় যাকে বলে ভোজন, লম্বা ঘুমে দুপুর পার, রাত্রে মাঝে-মাঝে মাখনলালের সঙ্গে হিসেবপত্রের একনিষ্ঠ আলোচনা। রোজগারের ভার ছেলে যখন নিয়েই নিলো, অগত্যা তিনি খরচের ভারটা নিজের হাতে রাখলেন। খরচ এবং না-খরচ দুটোরই। অর্থাৎ কতটা ব্যয়, কতটা

সঞ্চয়, এবং কী-ভাবে সঞ্চয়, এইসব কঠিন সমস্যার সমাধানে রাঘববাবুর মাথা খাটলো, এবং তাঁর ইকনমিক প্ল্যানিং-এ হিরণ্ময়ীর অনুমোদন এতই নিশ্চিন্ত যে, মাখনলালের কোনো কথা বলারই দরকার করে না। কথা বলার ফুরশৎও তার নেই, হয়তো ইচ্ছাও না, কাজের ঝোঁকেই ভরপুর সে, অন্য সব ওঁদের হাতে ছেড়ে দিয়ে সে বরং নিশ্চিন্তই হ'লো। বাড়ির খাওয়া-পরা এখন খুব সচ্ছল—পরার চাইতে খাওয়াটাই বেশি—কিন্তু দাম-টাম আগুন হ'লেও খেতে আর মানুষ কত পারে, আর বেশি টাকার দুশ্চিন্তাই কি নেই-টাকার ভাবনার চাইতে কম! বাইরে হাল-চাল কিন্তু তেমনি, সব আগের মতোই আধ-ময়লা গরিবভাবের, চেহারা দেখে কেউ বুঝবেই না যে, এই পরিবারের আয়ের অঙ্ক দুন-চৌদুন ছাড়িয়ে এখন দশগুণ।

আপনারা ভাবছেন এঁরা খুব সংযমী? ঠিক হয়তো তা নয়, হয়তো একেবারে পাইকেরি আড়ম্বর দেখাবেন ব'লেই খুচরোগুলি এঁরা বাদ দিচ্ছিলেন। ব্যাঙ্কে এঁদের আস্থা নেই, মাটিই খাঁটি। রাঘববাবু জমি কিনছেন, সোনা, হিরণ্ময়ীর গয়নার কথা ছেড়েই দিলাম। মেয়েদের বিয়েরও প্রায় সময় হ'লো। একজনের তো শাবেকি-মতে শিগগিরই, তবে ছোটোটিকে, হিরণ্ময়ীর দু-নম্বর পণ, বি. এ. পাশ করানো চাই। বি. এ. পাশ ছেলের শুধু না, বি. এ. পাশ মেয়েরও মা হবেন তিনি; 'দেখুক ওরা, শুনুক, বুঝুক যে, বিদ্যেতেও আমরা কিছু কম না!'

ওরা মানে অবশ্য পাশের বাড়ি, ঐ প্রোফেসরের গরবিনী বৌ। কেমন—দেখলে তো এবার! বিয়ে দিলে রাজরানী হ'তো মেয়ে, ছেলে আমার লক্ষপতি আজ!

ঠিকে-ঝির মুখে পাকে-প্রকারে বার্তাও পাঠিয়েছিলেন হিরণ্ময়ী, যেদিন রাঘববাবু বালিগঞ্জে অর্ধেক-শেষ-করা একটা বাড়ি কিনলেন সে-খবরটাও ভোলেননি;—সে-সব যথাস্থানে পৌঁচেওছিলো, কিন্তু প্রতিপক্ষের মৌনভঙ্গ হ'লো না। তাঁদের কাছে প্রতিবেশীর যেমন অস্তিত্বই নেই, তেমনি হিরণ্ময়ী প্রতিবেশীর কথা ভুলতে পারেন না। অদ্ভুত তাঁর প্রতিযোগিতা, আশ্চর্য তাঁর প্রতিহিংসার ইচ্ছা।

ভগবান দয়া করলে বোধহয় এমনিই হয়; হিরণ্ময়ীর সে-ইচ্ছাও প্রায় পূর্ণ হ'লো। শোনা গেলো, প্রোফেসরের ঘরে নাকি এখন হাঁড়ি চড়ে না। ভারি খুশি হলেন কথাটা শুনে, একদিন ছেলেকে ডেকে সবিস্তারে শোনালেন সব।

বলবার মতো খবর বইকি। সুভদ্রবাবু ছ'মাস ধ'রে মাইনে পাচ্ছেন না;—কোথাকার পচা কলেজ একটা, কোনোদিনই ঠিক-ঠিক মাইনে দিতো না, আশি টঙ্কুলি হাতে গুঁজে, আড়াই-শো লিখিয়ে নিতো। ও-সব সাত-সতেরো ফুটুনি থাকলে হবে কী—ভিতরে ফক্কিকার। ট্যুশনি ক'রে নোটবই লিখে চালাতো। এখন কাগজ নেই ব'লে নোট-ফোট আর ছাপাচ্ছে না কেউ, এদিকে ছেলেরা সব ঠাশঠাশ চাকরি পাচ্ছে—মাস্টার রেখে পড়াবে কে? এখন নাকি এমন অবস্থা যে—

চুপ ক'রে এ-পর্যন্ত শুনে মাখনলাল জিগেস করলো, 'তুমি জানলে কী ক'রে?'

'বাঃ, হরিমতি ওদের বাড়িতেও বাসন মাজে না? ও-ই তো কাল বলছিলো যে, ওখানে আর পোষাবে না তার···সত্যি, ও গরিব মানুষ, পেটের দায়ে খাটে, মাইনে না-পেলে···তা চাকর-বাকর তো বেশি কথাই···রোজ নাকি বাজারও হয় না। এদিকে মেয়েটা বি. এ. পরীক্ষা দেবে এবার—তার ফিশের টাকা—'

এখানে বোধহয় সুপুত্র মাখনলাল কিছু ব'লে-ট'লে থাকবে—পরের খবরে আমাদের দরকার কী, বা আস্তে তার চেয়েও মৃদু কোনো প্রতিবাদ। হিরণ্ময়ী তখনই সুর বদলালেন —তা তো ঠিকই, তা তো ঠিকই, আমি বাপু অত সাতে-পাঁচে নেই—তবে কিনা মেয়েটার কথা ভাবছিলাম, বিয়েও হ'লো না—তা আমি বলি কী, বিদ্যাশিক্ষা তো অনেক হ'লো, তুই বলিস তো এবার একটু অন্য রকম শিক্ষা দিই।'

মোটা মাখনলাল এই সূক্ষ্ম কথার মানে বুঝলো না, হিরণ্ময়ী তাই কথাটা বিশদ করলেন।

'একবার টিপে দেখবো নাকি প্রোফেসরের বৌকে? আর দেখবারই-বা আছে কী—ব'র্তে যাবে না এখন তু ক'রে ডাকলে!'

খুব একটা গৌরবের হাসিতে উদ্ভাসিত হ'য়ে ছেলের দিকে তিনি তাকালেন, কিন্তু মাখনলালের স্বভাবতই গম্ভীর মুখমণ্ডল

এখন প্রায় কঠোর দেখালো, কথা না-ব'লে বেরিয়ে গেলো আস্তে-আস্তে, যেতে-যেতে অস্ফুটে শুধু বললো, 'বাজে!' মন্তব্যটা কার উদ্দেশ্যে তা ঠিক বোঝা গেলো না।

সেদিন কাজের শেষে বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হ'লো মাখনলালের। প্রোফেসরের বাড়ির সামনে এসে হঠাৎ মা-র মুখে-শোনা কথাগুলি তার মনে পড়লো। একটু দাঁড়ালো, মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলো বাড়ির দিকে। অন্ধকার;— শুধু দোতলার একটি ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা চলছে, আর সেই পাখার ব্লেডের মস্ত কালো ছায়া ঘুরছে দেয়ালে। শুধু এটুকুই দেখা গেলো, আর-কিছু না। মা-র সব কথাই বোধহয় ভুল— ভালোই আছে এরা। অন্তত তা-ই বিশ্বাস করার চেষ্টা করলো মাখনলাল। কিন্তু রাস্তা থেকে দোতলার দিকে তাকিয়ে কতটুকু বোঝা যায়।

কেমন একটা ছোট্ট কাঁটা মাখনলালের বুকের মধ্যে বাসা বাঁধলো—কাজের ফাঁকে-ফাঁকে হঠাৎ খচ ক'রে ওঠে। সত্যি কি ওরা খুব কষ্টে আছে? না, না—মা-র যত বাজে ও-সব! ওদের কষ্ট ভাবতে মা-র সুখ হয়, অকারণ ঈর্ষায় শুড়শুড়ি লাগে—তাই বাড়িয়ে বানিয়ে ইচ্ছে মতো—কিন্তু সত্যি যদি তা-ই হয়? হ'তেও তো পারে? হ'লে তার কী, সে কি করতে পারে, তার কী করবার আছে—কিছু না, কিছুই না? কিছুই যে তার করবার নেই, পাশের বাড়িতে—যদি মা-র কথাই সত্যি হয়—ভাত-কাপড়ে টান পড়লেও তাকে এই আত্মার

অতীত এবং প্রয়োজনের অতীত টাকার বস্তা নিয়ে চুপ ক'রেই থাকতে হবে, এ-কথা ভাবতে মাখনলালের অদ্ভুত একটু আঘাত লাগলো। তাতে আবার রাগ হ'লো নিজেরই উপর ;—আমিও কি আমার মা-র মতো, আমিও কি ওদের কথা ভুলতে পারছি না ?

এদিকে যুদ্ধের হুলুস্থূল দিন—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস—যুদ্ধ যেন এ-জীবনে শেষ হবে না। শেষ হবার তাড়াই-বা কিসের—এমন সুযোগ মানুষের জীবনে ক-বার আসে, বিশেষত বাঙালির জীবনে ! বালিগঞ্জের সেই বাড়ি নিয়ে উঠে-প'ড়ে লাগলেন রাঘববাবু ; মাল-মশলা কনট্রোলের দরেই জোগাড় হ'লো, কনট্র্যাক্টর ভরসা দিলো, মাস-চারেকেই শেষ হ'তে পারবে। বাড়ির ঢিলেঢোলা গেরস্ত ভাবটা, চটকদার আসবাবের অভাব—তারও এবার তিন-ডবল শোধ চাই, এই হ'লো হিরণ্ময়ীর মত। অতএব প্রত্যেক ঘরের আলাদা-আলাদা মাপমতো আনকোরা নয়া ছাঁদের চেয়ার, টেবিল, আলমারি, পালঙ্ক তৈরি হ'তে লাগলো নিজেদেরই কারখানায় ; মাখনলাল সোনার দামে সেগুন কিনলো, ডবল মজুরি কবুল ক'রে ভাগিয়ে আনলো পার্ক স্ট্রীটের কারিগর। হ্যাঁ—মা-বাপের এই উৎসাহে, এই 'ষড়যন্ত্রে' মাখনলালও যোগ দিলো—নিজের ইচ্ছায় ঠিক নয়, কিন্তু এ ছাড়া আর করবারই-বা আছে কী ? এটুকু ভালো হ'লো যে, আরো-খানিকটা কাজ তার বাড়লো। এসো কাজ ; —জীবনে যার আর-কিছুই নেই, মনের কোনো রস্তুই

যার জমলো না, তুমি তো সেই দুর্ভাগারই পরিত্রাণ। মাখনলালের এখন এমন অবস্থা যে, দিনের গাড়িটাকে কোনো রকমে রাত্তির বারোটার ঘুমের অতলে ঠেলে দিতে পারলে বাঁচে—দিনটা কেটে যাক, এ ছাড়া দিনের কাছে আর কিছু সে চায় না। কত দিন স্নানাহারও হয় না; লক্ষ্যই করে না, কষ্টও হয় না কোনো।

কিন্তু হিরণ্ময়ী লক্ষ্য করলেন, ছেলেকে যথোচিত সস্নেহে ভর্ৎসনাও করলেন। এমন করলে শরীর আর ক-দিন—এত যাদের ঘোরাঘুরি, তাদের কি আর গাড়ি না-হ'লে চলে। সেই-যে তারাপদ গাড়ির কথা বলেছিলো—

'পাওয়া গেলো না, মা।"

'হ্যাঃ! তুই মন করলে আবার পাওয়া যায় না!'

'থাক না, চ'লে যাচ্ছে তো বেশ।'

'ঐ তোর এক বিশ্রী স্বভাব—সবার জন্য সব হবে, শুধু নিজের বেলায় কিপটেমি। ঐ ভিড়ের মধ্যে ট্র্যামে-বাস্‌-এ আজকাল উঠতে পারে মানুষ।'

'সবাই উঠছে, মা—মেয়েরা সুদ্ধু।'

'মে-য়ে-রা! মেয়েদের কথা বলিসনে আমাকে। মেয়ে আর আছে নাকি আজকাল—মরদ, সব মরদ ব'নে গেছে। কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে মূর্তি কী এক-একটা!—হ্যাঁ, জানিস, প্রোফেসরের মেয়ে বি. এ. পাশ ক'রে চাকরিতে ঢুকেছে। বাপ এবার মেয়ের রোজগারে ব'সে-ব'সে খাবেন।'

এ-কথা উঠতেই মাখনলাল আস্তে স'রে গেলো সেখান থেকে, আয়নার সামনে দাড়ি কামাতে ব'সে গেলো। কিন্তু হিরণ্ময়ী তার পিছন-পিছন এসে যেন আপন মনেই বলতে লাগলেন— 'কেমন! এখন তো বুক ব'লে যাচ্ছে! আহা—তখন যদি মেয়েটার বিয়ে দিতুম—এমন জানলে কি আর—তা বাপু লজ্জা না-ক'রে মনের কথাটা মুখ ফুটে বললেই হয়!'

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে হিরণ্ময়ীর সেই একই কথা বার-বার।

এর ক-দিন পরে মাখনলাল দমদমে একটা কাজ সেরে ট্যাক্সিতে ফিরছে। লাটের বাড়ির মোড়ে, লাল আলোর সামনে থামতে হ'লো। প্রায় সন্ধে তখন, আপিশের ছুটির সময়, ট্র্যাম-বাস্-এর দিকে তাকাতেও ভয় করে। ফুটপাতে দাঁড়িয়ে আছে তিন-চারটি আপিশ ফেরতা বাঙালি মেয়ে···কী ক'রে তারা ট্র্যামে উঠবে, কখনো কি উঠতে পারবে। কিন্তু কেনই-বা এ-সব ভাবা, রোজই যাওয়া-আসা করে এরা—অভ্যেস আছে। তবু মাখনলাল আর-একবার তাকালো; এবার মনে হ'লো— হয়তো আছেও মনে হয়েছিলো—একজনের মুখ তার চেনা। হ্যাঁ—সেই—সেই প্রোফেসরের মেয়ে। ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়েছিলো ফুটপাত ঘেঁষে, মাখনলাল ভালো ক'রে তাকে দেখতে পেলো, এত কাছে থেকে আগে ছাখেনি। কেমন হতাশ চোখে তাকিয়ে আছে মালতী, মুখে ক্লান্তির শ্রী—ক্লান্তিটুকু সুন্দর তাকে মানিয়ে গেছে যেন। একবার তার দিকে, একবার নিজের পাশের শূন্য প্রশস্ত আসনের দিকে মাখনলাল

তাকালো—এমনি দু-তিন বার, কিন্তু একবারও চোখোচোখি হ'লো না। ডাকবে? কিন্তু কী ব'লে ডাকবে, আর সেটা—সেটা কি উচিত? যদি কিছু মনে করে—যদি বলে—কিছুই না বলে—কিন্তু—এমনি ভাবতে-ভাবতে লাল আলো সবুজ হ'লো, ট্যাক্সি ফের চলতে লাগলো, পিছনে প'ড়ে থাকলো ট্র্যামে ওঠার হতাশ প্রত্যাশা। মাখনলাল বাড়ির দিকেই যাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে গেলো চিৎপুরে, নতুন বাড়ির ড্রেসিংটেবিলের আয়না বাছতে।

আরো কয়েক মাস কাটলো।

রাঘববাবুর বাড়ি প্রায় শেষ, আসবাবপত্র তৈরি, এখন একটা শুভদিন দেখে গৃহপ্রবেশ করলেই হয়। হিরণ্ময়ী কোমরে হাত দিয়ে সারা দিন ঘুরে বেড়াচ্ছেন, বাজে জিনিশ বেচে দিচ্ছেন, পুরোনো শাড়ির বদলে এলুমিনিয়মের বাসন রাখছেন, বিলিয়ে দিচ্ছেন ছেঁড়া জামা-কাপড়। শ্বশুরের আমলের কয়েকটা ষ্টীল-ট্রাঙ্ক ছিলো—রং চ'টে গেছে, কোনোটার তালাও ভেঙেছে, কিন্তু খুব পোক্ত এখনো;—সেগুলো নিয়ে কী করা যায় একদিন সকালবেলা ব'সে-ব'সে তা-ই ভাবছেন, এমন সময় ছোটো মেয়ে লক্ষ্মী ছুটে এসে খবর দিলো যে, সুভদ্রবাবুর বাড়ি পুলিশে ঘেরাও করেছে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ মা, সত্যি পুলিশ এসেছে, কত লোকজন··· দেখবে'সো···

লক্ষ্মী মা-র হাত ধ'রে টানলো, কিন্তু তার দরকার ছিলো না। ব্যাপারটা, শুধু ছোটোদের না, বড়োদেরও দ্রষ্টব্য বইকি। হিরণ্ময়ীর তো বিশেষ।

হিরণ্ময়ী প্রথমে রাস্তার দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। প্রোফেসরের বাড়ির সামনে ছোটোখাটো ভিড় জমেছে, তার মধ্যে পুলিশের লাল পাগড়ি জ্বলজ্বল করছে রোদ্দুরে। নিচের ঘরের দরজাটা হাঁ-করা খোলা, মনে হ'লো, বাইরে থেকে ধাক্কা দিয়ে ভেঙেছে; কয়েকজন লোক হুড়মুড় ক'রে ভিতরে ঢুকে পড়লো, আর-একজন হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে-পিটিয়ে প্রোফেসরের পিতলের নেম-প্লেটটা তুলে ফেলে দিলো রাস্তায়। হিরণ্ময়ী মন্ত্রমুগ্ধের মতো দেখতে লাগলেন। চার-চার কুলি ধরাধরি ক'রে প্রোফেসরের হলদে-কাপড়ে-মোড়া বড়ো সোফাটা রাস্তায় এনে রাখলো, তারপর চেয়ার দুটো, তারপর সেণ্টার টেবিল··· পথ দিয়ে চলতে-চলতে একবার থমকে দাঁড়ালো সবাই, আশে-পাশের আট-দশখানা বাড়ির বারান্দায় জানলায় জোড়া-জোড়া চোখে বিকীর্ণ হ'তে লাগলো কৌতূহল, হয়তো সভয় কৌতুক, সেইসঙ্গে একটু-বা করুণা।

এর পর হিরণ্ময়ী ভিতর দিকের বারান্দায় এলেন। সেখান থেকে ওদেরও ভিতরের বারান্দা চোখে পড়ে, জীবনের প্রতি-দিনের চলাফেরার ছবি, ভেসে আসে প্রতিবেশীর অস্তিত্ব বিষয়ে নির্বিকার হাসির টুকরো, গানের টুকরো, বেঁচে থাকার আনন্দের টুংটাং।

সেই বারান্দা এখন শূন্য প'ড়ে আছে, নিঃশব্দ। দরজা-জানলা বন্ধ, ভিতরে কেউ আছে ব'লে মনেই হয় না। কী হয়েছে, ব্যাপার কী? নতুন আর কী হবে; হরিমতি তো সব বলেইছে। রাজ্যের বাড়িভাড়া বাকি, এখন বাড়িওলা মালপত্র ক্রোক করেছে আরকি, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যাবে সব। তারপর? ওদেরও কি হাত ধ'রে টেনে বের ক'রে দেবে রাস্তায়? প্রোফেসরের বৌকে, বাচ্চা দুটোকে, আর ঐ বি. এ. পাশ চাকরিকরুনি মেয়েটাকেও? তারপর সুভদ্রবাবুকে হাত-কড়া পরিয়ে সকলের চোখের সামনে দিয়ে ধ'রে নিয়ে যাবে? উশ্‌—সত্যি—বেচারা—ছী-ছি—কী কাণ্ড!

'কী কাণ্ড!' হিরণ্ময়ী ছুটে এলেন মাখনলালের কাছে, 'প্রোফেসরকে তো হাত-কড়া পরিয়ে ধ'রে নিয়ে গেলো।'

কী!

মাখনলাল তখন বেরোবার জন্য তৈরি হচ্ছে, মাথার মধ্যে কাঠ, লোহা, পেরেক, বল্টুর পঞ্চাশ ভাবনার ঘুরপাক—এরই মধ্যে হঠাৎ হিরণ্ময়ী উড়ে এসে সুভদ্রবাবুর বাড়ির এবং বাড়িওলার খবর সবিস্তারে তার কানে ঢাললেন।

সেদিন কাজে বেরোতে দেরি হ'য়ে গেলো মাখনলালের। খবরটা শুনে তার কী মনে হ'লো, কী ভাবলো, তা আমি বলতে পারবো না; এর পরের ঘটনা তার মুখেই যেটুকু শুনেছি, এবং যে-রকম শুনেছি, তারই সঙ্গে আমার অনুমান মিশিয়ে আপনাদের শোনাই। ততক্ষণে—একবার সে বারান্দায় গিয়ে

দেখলো—আরো জিনিশ বের করা হয়েছে; বই-ভরা-ভরা বুককেস, খাবার টেবিল, রেডিও, গ্রামোফোন, ফ্রেমে বাঁধাই বড়ো-বড়ো ছবি। এক পলক তাকিয়েই মাখনলাল ঘরে এসে বসলো; হিরণ্ময়ী এসে আরো এক কাহন কথা বললেন—সত্যি, কী-কষ্ট ওদের—তা আমরা আর ভেবে কী করবো—যার যেমন কপাল—আর কপালই-বা বলি কেন—আয় বুঝে ব্যয় না-করলে—কিন্তু মাখনলাল কোনো কথারই জবাব দিলো না, মা-র চোখেও চোখ ফেললো না।—কী আশ্চর্য, সারা বাড়িতে জনপ্রাণীর সাড়া নেই—পালিয়েছে নাকি সব? —এতদিন আছে পাড়ার মধ্যে, কোন্ লজ্জায় আর মুখ দেখাবে! ইত্যাদি ইত্যাদি কথাতেও মাখনলালের যখন মৌনভঙ্গ হ'লো না, তখন হিরণ্ময়ী ছেলের মুখ থেকে কিছু-একটা শোনবার আশায় জিগেস করলেন, 'তুই আজ বেরোবি না?'

মাখনলাল বললো, 'হুঁ', কিন্তু তার পরেও তেমনি মুখ ফিরিয়ে ব'সে থাকলো। অগত্যা হিরণ্ময়ী চ'লে এলেন সেখান থেকে, পর্যবেক্ষণ করতে আবার একবার বারান্দায় এলেন।

ততক্ষণে ব্যাপারট পুরোনো হ'য়ে গেছে। সকালবেলার টাটকা উত্তেজনা আর নেই; আশে-পাশের বারান্দা থেকে জোড়া-জোড়া কৌতূহলী চোখ স'রে গেছে; কেজো বেলা বাড়লো—সকলেরই কাজ আছে, আছে রান্নার তাড়া, আপিশের তাড়া, হাঁ ক'রে পরের ব্যাপার দেখলেই তো আর দিন কাটবে না—আর দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখাই-বা যায় কতক্ষণ। সব মিটতে

বেশ দেরি হবে মনে হচ্ছে। ফুটপাতে রোদ্দুরে প'ড়ে আছে প্রোফেসরের অসহায় ফার্নিচার—নাজিমসুদ্ধু খাট, লেখার টেবিল, চায়ের বাসন, ইলেকট্রিক পাখা—আরো আছে, আসছে, একটা সংসারের জিনিশ তো বড়ো কম না।

হিরণ্ময়ী সেখানে আর দাঁড়ালেন না, লক্ষ্মীকে অবজারভেশন পোস্টে বসিয়ে চ'লে এলেন রান্নাঘরের তদারকে।

যখন সকরুণ প্রতিবেশীরা যে যার কাজে মন দিলো, রান্না-ঘরের ছ্যাকছ্যাক শব্দে কৌতূহল চাপা পড়লো, যখন পাড়ার মধ্যে কোনো-এক বাড়ির চমকপ্রদ ঘটনাটাও প্রায় প্রতিদিনের তুচ্ছতায় মিশে এলো, তখন ঐ বাড়ির ভিতরদিকের একটি দরজা আস্তে খুলে গেলো, বারান্দায় বেরিয়ে এলো একটি মেয়ে, সেই মেয়ে, যার আঁচলের হাওয়া কোনো-একদিন ঐ বারান্দা থেকেই মোটা মাখনলালকে ছুঁয়ে গিয়েছিলো। এর মধ্যে অনেকদিন সে মাখনলালের চোখে পড়েনি, কিন্তু আজ ঘরে ব'সে-ব'সে মাখনলাল দেখলো তাকে, দেখে যেন চিনলো, ঠিক চিনতে পারলো। রেলিঙে ভর দিয়ে একটু দাঁড়ালো সে, একবার হাত তুলে কপাল থেকে চুল সরালো, তারপর চকিতে ফিরে গেলো ঘরে, আবার বন্ধ হ'লো দরজা। আর মাখনলাল—মাখন-লাল তখন যা করলো তা একটু অদ্ভুত, হয়তো আপনারা হাসবেন শুনে, কেন যে সে ওরকম করলো সে নিজেও তা জানে না, কিন্তু সে-মুহূর্তে—পরে আমাকে একদিন সে

ব'লেছিলো—সেটাই তার 'এসে গেলো', যেন নিজে-নিজেই হয়ে গেলো সব।

মাখনলাল আর দেরি করলো না, চটিতে অর্ধেক পা ঢুকিয়ে মস্ত অশোভন শরীর নিয়ে বেগে বেরিয়ে এলো রাস্তায়। ফুটপাতে ফার্নিচারের ভিড় তাদের বাড়ি অবধি ঠেকেছে, বার্নিশে ঝিলিক দিচ্ছে এগারোটার রোদ্দুর, তারই মধ্য দিয়ে পথ ক'রে পাশের বাড়ির সামনে সে দাঁড়ালো। হাঁ-করা দরজা তাকে বাধা দিলো না, সামনেই সিঁড়ি পেয়ে—একটু দ্বিধা না, ভাবনা না—সোজা উঠে এলো উপরে। সামনের ঘরটা সত্যবিধবার মতো প'ড়ে আছে, শুধু দেয়ালে একটা ছবি ঝুলছে, যেন সত্যবিধবারই সিঁথিতে দীর্ঘ-জীবনের রক্তিমার স্মৃতি। পাশের ঘরে কতগুলি কালো-কালো ঘামে-তেলতেলে মানুষ জিনিশ ঠেলছে—মাখনলাল হনহন ক'রে পার হ'য়ে এলো। এর পর আর-একটি ঘর, একেবারে কোণে, দরজা বন্ধ— এখানেই আছে বোধহয় বাড়ির লোক? টুকটুক টোকা দিলো দরজায়—কোনো জবাব নেই। আবার টোকা, তারপর আস্তে ধাক্কা দিতেই ভেজানো দরজা খুলে গেলো; ভিতরের দৃশ্য মাখনলালের চোখে আর গোপন থাকলো না।

ছোটো ঘর। চারটি শাদা দেয়াল ছাড়া আর-কিছুই তাতে নেই, কিন্তু যেখানে-যেখানে জিনিশ ছিলো, মেঝেতে তার দাগ এখনো মোছেনি। মেঝেয় জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে বাড়ির ক-টি মানুষ, প্রোফেসর, তাঁর স্ত্রী আর কন্যা, একটু দূরে দুটি বাচ্চা

গোল হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, একজনের পা আর-একজনের গায়ের উপর তোলা। এতদিন যাদের দূর থেকে দেখেছে, আজ হঠাৎ অদ্ভুত অবস্থায় তাদের মুখোমুখি কাছাকাছি দেখতে পেয়ে মাখনলাল ধাক্কা খেয়ে বুঝলো এরা তার কত দূর, কত অচেনা। কেন এসেছে এখানে ? কী সে করতে পারে ?

অন্য পক্ষও নীরব। প্রোফেসর একবার চোখ তুলেই নামিয়ে নিলেন, তাঁর স্ত্রী চোখই তুললেন না, ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো শুধু মালতী—হ্যাঁ, নামটা মাখনলাল এখনো ভোলেনি।

তাড়াতাড়ি দরজার কাছে এসে বললো, 'আপনি! আপনি কেন এসেছেন ?'

রুক্ষ স্বর, অভ্যর্থনার ছিটেফোঁটাও নেই, তবু মাখনলাল যেন গান শুনলো। 'আপনি! কেন এসেছেন ?' তার মানে তাকে চিনেছে, তাকে চেনে! কুণ্ঠা ঝ'রে পড়লো তার, সাহসে ভ'রে উঠলো মন। খুব সহজভাবে বললো, 'আমাকে আসতেই হ'লো। এর একটা ব্যবস্থা হওয়া তো দরকার।'

মালতী বোধহয় কিছু বলতে যাচ্ছিলো, কোনো প্রখর আত্মসম্মানের প্রতিবাদ, কিন্তু মাখনলাল তখনই সেখান থেকে স'রে এলো। পাশের ঘরেই ছিলো বাড়িওলার লোকজন, তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ব'লে এই সমস্ত গোলমালটা মিটিয়ে দিলো ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। প্রোফেসরও উঠে এলেন সেখানে —ক্ষীণ স্বরে কথা বললেন—ঐ অবস্থায় যতটা সম্ভব আপত্তিও

জানালেন মাখনলালের এই মধ্যবর্তিতায়; আর শেষপর্যন্ত সব যখন মিটে গেলো, সেই ঘামে-তেলতেলে লোকগুলোই আবার সব জিনিশপত্র তুলে ঠিক-ঠিক জায়গামতো সাজাতে লাগলো, তখন—ততক্ষণে—প্রোফেসর এত ক্লান্ত যে, কোনো কৃতজ্ঞতার মামুলি কথাও তাঁর মুখ দিয়ে বেরোলো না, আর তাতে মাখনলাল ভারি আরাম পেলো মনে-মনে।

দিনের অবশিষ্ট সময় যেন উড়াল দিয়ে চ'লে গেলো তার। কী যে ভালো লাগলো তার সেই দিনটি, ভালো লাগলো কাজ, লোকজন, কলকাতার শহর—বোধহয় পৃথিবীটাকেই ভালো লাগলো। আর তার প্রতি পৃথিবীরও যেন দয়ার আজ শেষ নেই; যাকে যা বলছে তাতেই সে এক কথায় রাজি, কিছুই যেন কোথাও আর আটকায় না, যেটা চায় সেটা মনে-মনে চাওয়া মাত্রই যেন সামনে হাজির। আর কাজের শেষে তার বাড়ি ফেরাও আজ অন্য রকম; রোজ ফেরে ফিরতে হবে ব'লেই, কোনোখানে ক্লান্তির সীমা আছে ব'লেই;—আজ তার মনে হ'লো—ঠিক মনে হ'লো না, তবু রাত্রির আর হাওয়ার ভাবটা যেন এই রকম যে, কেউ বা কিছু সে ফিরবে ব'লে অপেক্ষা ক'রে আছে।

প্রোফেসরের বাড়ির সামনে স্বতই তার পা থামলো। ঘরে-ঘরে আলো জ্বলেছে, দোতলার ঘরের দেয়ালে তেমনি ঘুরছে পাখার ব্লেডের কালো ছায়া। নিশ্চয়ই ঠিক আছে সব, আর-কোনো গোলমাল হয়নি, তবু ভাবলো একবার খোঁজ নিয়ে

যাই। এ কি তার বিশুদ্ধ হিতৈষণা? তার নিজের কোনো স্বার্থ কি ছিলো না তাতে? এই প্রশ্ন আপনাদের মনে এখন যেমন উঠছে, তেমনি তখন আর-একজনের মনেও উঠেছিলো। সেখানেই এই গল্পের শেষ।

আস্তে টোকা দিতেই নীচের ঘরের দরজা খুলে গেলো, আর মাখনলাল মালতীকেই দেখতে পেলো তার সামনে দাঁড়ানো। অন্য কেউ হ'লে সে সুখী হ'তো, কিন্তু এখন আর ফিরে যাবার পথ নেই।

'আমি—আমি একবার এসেছিলাম—'

একেবারেই অনাবশ্যক ঘোষণা, এবং এর উত্তরে অন্য জন—বা প্রতিপক্ষ—কিছুই যখন বললো না, তখন এর অনাবশ্যকতা কমবুদ্ধির মাখনলালও বুঝতে পারলো।

'সব ঠিক আছে কিনা তা-ই একবার দেখতে—'

'আপনি আসুন'—বলবার ধরনটা এমন, যেন ডাক্তার রোগীকে ভিতরে আসতে বলছে—'হ্যাঁ, সব ঠিক আছে।'

মাখনলাল ভিতরে এসে দাঁড়ালো। তাকিয়ে মনে হ'লো সবই ঠিক আছে, দেয়ালে ছবি, শেলফে বই, কোণে রেডিও—ঠিক যেমন সে যেতে-আসতে উঁকিঝুঁকি দেখেছে। কোনো-এক সময়ে তার মনে হয়েছিলো ঐ ঘরের মধ্যে না জানি কত আনন্দ, কিন্তু এখন ঐ সুন্দর সাজানো পরিবেশে তার সারা-দিনের ভালো লাগাও যেন নিবে গেলো—মনে হ'লো তার কোনো ভিত্তি নেই, অর্থ নেই।

'আপনি বসুন।'

বসবার একটুও ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু কে যেন মাখনলালকে বাধ্য করলো।

একটু দূরে ব'সে মালতী বললো, 'আমি জানতাম আপনি আবার আসবেন। আপনার জন্যই ব'সে ছিলাম এখানে।'

এ-কথা শুনে মাখনলাল তার সমস্ত মোটা শরীরে কেঁপে উঠলো।

'আপনাকে একটা কথা আমার জিগেস করার আছে।'

'বলুন।'

'এ-কাজ আপনি কেন করলেন ?...চুপ ক'রে আছেন কেন ? বলুন।'

তার প্রশ্নকারিণীর চোখের দিকে তাকিয়ে মাখনলাল বুঝলো সে অপরাধ করেছে।

'কেন করলাম ? তা তো আমি জানি না।'

'আপনি জানেন না ? তাহ'লে আমার মুখে শুনুন। পরোপকারের আত্মপ্রসাদ কি কম! দরিদ্রকে দয়া করার সুযোগ পেলে বেশ ভালোই তো লাগে! অন্যের কৃতজ্ঞতা অতি উপাদেয় বস্তু—তা-ই না ?'

আধুনিক শিক্ষিত তরুণীর সুগঠিত ঠোঁট থেকে প্রত্যেকটি কথা স্পষ্ট উচ্চারণে খ'সে পড়লো। একসঙ্গে এত-সব শক্ত-শক্ত কথা শুনে মোটা মাখনলাল আরো যেন বোকা হ'য়ে গেলো ; উত্তরে কিছুই বলতে পারলো না।

'আর তা ছাড়া, এর মধ্যে আপনার উদ্দেশ্যও আছে। এই উপায়ে আমাদের হাতের মুঠোয় নিয়ে এসে আমাদের উপর প্রতিশোধ নেবেন—এই তো আপনি ভেবেছেন!'

'উদ্দেশ্য', 'প্রতিশোধ', এ-সব কথায় অর্থহীন আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই মাখনলাল শুনতে পেলো না। মনে-মনে সে কথা খুঁজলো, অন্ধকারে মানুষ যেমন হাৎড়ায়, কিন্তু কী বলবে, কী তার বলবার আছে কিছুই খুঁজে পেলো না।

'কিন্তু আপনি যা ভাবছেন, তা হবে না, হবার নয়।'

এবার মাখনলাল উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'আমি কিছুই ভাবিনি। আপনাদের একটু অসুবিধে হয়তো ঘটালাম, সেটা —ভুলে যাবেন।'

'আপনার টাকা ফেরৎ দিতে পারলে তবে তো ভুলে যাবার কথা। কিন্তু ফেরৎ আপনি পাবেন—হয়তো দেরি হবে—কিন্তু নিশ্চয়ই আমরা ফেরৎ দেবো।'

'বেশ।'

'আর-একটা কথা আপনি শুনে যান। এ-বাড়িতে আপনি আর আসবেন না—কখনো না, কোনো কারণেই না।'

দরজার ধার থেকে একবার ফিরে দাঁড়িয়ে মাখনলাল আস্তে বললো, 'না, আর আসবো না।'

রাস্তায় এসে মাখনলাল বাড়ি ছাড়িয়ে চ'লে গেলো; তার প্রকাণ্ড অশোভন শরীরের অসুন্দর চলন নিয়ে অনেক, অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালো সেই রাত্রে, ব্ল্যাক-আউটের

অন্ধকার সেদিন তার মনে হ'লো বড়ো ভদ্র, সহৃদয়, কৌতূহলহীন।

কনট্র্যাক্টরের মোটা গলায় মন্থর আওয়াজে ঘরটা যেন এতক্ষণ ভ'রে ছিলো; তিনি থামতেই আরো গভীর হ'য়ে নামলো ওয়েটিংরুমের রাত্রি, রাত্রির প্রতীক্ষমাণ নীরবতা। দূর থেকে অনেকটা কুয়াশার পরদা ফুঁড়ে, শান্টিং-এর আওয়াজ এসে পৌঁছলো, যেন স্বপ্নে-আওড়ানো কোনো গোঙানি, আরো দূরে হঠাৎ একবার আকাশ ফুঁড়ে দিলো কুকুরের আর্তস্বর। সেই শব্দের রেশ যখন থামলো, তখন মৃদু একটু কেশে, দিল্লিওলা বললেন:

'এখানেই আপনার গল্পের শেষ?'

'আপনি কি এর পরে আরো শুনতে চান?' সাহিত্যিকের ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটলো।

বড়ো চাকুরেটি সকলের কাছে তোয়াজ পেয়ে তাঁর অভ্যাস—সেই বাঁকা হাসিতে একটুও বিচলিত হলেন না। গম্ভীর মুখে বললেন, 'একটা কথা জানতে চাইলে বোধহয় দোষ হয় না। সেই টাকা কি প্রোফেসর ফেরৎ দিয়েছিলো?'

কনট্র্যাক্টর হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিলেন। থাবার মতো তাঁর হাত, আঙুলের গাঁট মোটা-মোটা, রোমশ; আর মুখের ব্যাস এত বড়ো যে, ঠোঁটে সিগারেটের মতো হালকা জিনিশ ঠিক যেন মানায় না। আনাড়ির মতো ফুড়ুক ক'রে ধোঁয়া

ছেড়ে বললেন, 'মাখনলালের এই কাহিনীর আমি এটুকুই জানি, এর বেশি কিছু জানি না।'

'এর বেশি দরকারও নেই,' সাহিত্যিক অভিজ্ঞভাবে মন্তব্য করলেন। 'এর পর কী হ'লো, তার সঙ্গে মেয়েটির আর দেখা হয়েছিলো কি হয়নি, উপকারীর অপমান ক'রে মেয়েটিরই-বা পরে কেমন লেগেছিলো, কোনোদিন সন্ধ্যার পরে সেই মস্ত মোটা বিশ্রী চেহারার মানুষটিকেই দেখার জন্য সে তার নিচের ঘরে জানলার ধারে বই পড়ার ছল ক'রে ব'সে থেকেছে কি থাকেনি—এ-সব কথাই অবান্তর। সেই-যে মনের মতো মেয়ে—আমাদের মনের মধ্যেই যার বাসা—তাকে জীবনে কোনো-একবার কোনো-এক বাস্তব মানুষের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলো মাখনলাল—সেটুকুই খাঁটি, সেটুকুই দামি, অন্য কিছুই কিছু না। নিশ্চয়ই নতুন বাড়িতে উঠে যাবার কিছুদিনের মধ্যে মাখনলাল মা-র পছন্দমতো গৃহলক্ষ্মী এনেছিলো—এতদিনে ছেলেপুলে নিয়ে তার সংসার ভ'রে উঠছে, টাকাও রোজগার করছে খুব—কিন্তু পরের কোনো ঘটনাই আগের ঘটনাকে বাতিল ক'রে দেয় না; মাঁখনলাল তার মালতীর কাছে যদি কিছু পেয়ে থাকে তা তো পেয়েই গেছে, তা তার জীবনেও হারাবে না।—কী বলেন আপনি?' কথার শেষে সাহিত্যিক কনট্র্যাক্টরের দিকে কটাক্ষ করলেন।

'মাখনলালের কথা এখন থাক, এবার আপনাদের পালা', ব'লে কনট্র্যাক্টর বড়ো-বড়ো দাঁত বের ক'রে হাসলেন।

'আপনি বলুন', ডাক্তার চাকুরেটিকে চোখ টিপলেন।

দিল্লিওলা যেন এর জন্য প্রস্তুতই ছিলেন। আপত্তি তুলে সময় নষ্ট করলেন না—বোধহয় আগের গল্প শুনতে-শুনতে নিজেরটাও তিনি ভেবে রেখেছিলেন, এটাও হয়তো তাঁর আপিশের সুশৃঙ্খল অভ্যাসের ফল। যেমন আপিশে ঠিক-ঠিক সময়মতো নিয়মিত নিজের কাজটুকু ক'রে যান, তেমনি মসৃণ, অনুচ্চ গলায়, মাপা-মাপা ছোটো কথায় একটু পরেই বলতে আরম্ভ করলেন—

গগনবরনের গল্প

আমার নাম, গগনবরন চ্যাটার্জি। দিল্লি-শিমলের খুদে মাতব্বর আমি, সেখানে জি. বি. চ্যাটার্জি নামে সবাই আমাকে চেনে, বড়ো-বড়ো সরকারি দলিলে জি. বি. সি. দস্তখৎ অন্তত হাজার বার প'ড়েছে। একুশ বছর বয়সে আমি বিলেত গিয়েছিলুম, চব্বিশ বছরে ফিরে এসে চাকরি পেলুম দিল্লিতে। তারপর থেকে এ-মুল্লুকেই বরাবর। এতদিন থাকতে-থাকতে এখন যেন ভাবতেই পারি না যে, কোনোদিন অন্য কোথাও ছিলুম, বা থাকবো। পেন্সনের পরে? তার ব্যবস্থাও ক'রে নিয়েছি, দিল্লিতে সিভিল লাইন্সে নিজেরই বাড়ি আমার, বারান্দা থেকে যমুনা দেখা যায়। স্যাৎসেঁতে বাংলাদেশে স্ত্রীর শরীর টেঁকে না—তাঁর বাপ ছিলেন আগ্রা কলেজের প্রিন্সিপাল

—ছেলেমেয়েরা হিন্দি-ভাঙা বাংলা বলে, আরো বেশি বলে ইংরেজি—আর এই যে আমি এতক্ষণ ধ'রে আপনাদের সঙ্গে বাংলা বলছি, এটাও আমার পক্ষে নতুন। বাংলার সঙ্গে মোলাকাৎ আমার কিছুই নেই আজকাল, কোনোই টান নেই সেদিকে, কালেভদ্রে যা কলকাতায় যাই তাও সরকারি কাজে, দরকারের বাইরে এক দিনও থাকি না।

অথচ আমি বাংলাদেশেই জন্মেছিলুম, বড়ো হয়েছিলুম, জীবনের প্রথম চ্যাপ্টার সেখানেই আমার কেটেছিলো। তখন, সেই সুদূর ছেলেবেলায় আমার এই এখনকার 'আমি'কে কি কল্পনাও করতে পারতুম? না কি এখনই সেই তখনকার একটি বালক, একটি লাজুক স্বভাবের যুবককে এই আমারই আগের এডিশন ব'লে ভাবতে পারি? সে-সব যেন মুছেই গেছে মন থেকে, ভেবেছিলুম ভুলেই গেছি—কিন্তু আজ আপনাদের কথাবার্তা শুনে হঠাৎ খুব স্পষ্ট হ'য়েই মনে পড়ছে।

মনে পড়ছে একটি ছেলেকে, সাধারণ বাঙালি-ঘরের ছেলে, বয়েস সতেরো, মফস্বলের শহরে কলেজের ছাত্র। ম্যাট্রিকে স্কলারশিপ পেয়েছি, অনেকের অনেক উচ্চাশার আমি কেন্দ্র; সেই উচ্চাশার উপযোগী হবার চেষ্টাতেই বেশির ভাগ সময় আমার কাটে। এখন আমাকে দেখে আপনাদের তা বিশ্বাস হওয়া বোধহয় শক্ত, কিন্তু সেই বয়সে আমি বড্ড বেচারা-গোছের 'ভালো ছেলে' ছিলুম, গুরুজনের বাধ্য, পড়াশুনোয়

পরিশ্রমী, আর সকলের কাছেই অতিশয় বিনীত, প্রায় চোখ তুলেই তাকাই না।

তা হ'লে হবে কী? আমার বয়সের ধর্ম ভিতরে-ভিতরে তার নিজের কাজ নির্ভুল নিয়মে ক'রে যাচ্ছিলো। আপনারা ভালোবাসার কথা বলছিলেন, আমিও তখন ভালোবাসার কথা ভাবতুম। কত কষ্ট ক'রেই কেমিষ্ট্রির ফর্মূলা মুখস্ত করেছিলুম, কিন্তু জীবনের আদি ফর্মূলা নিজে-নিজেই শেখা যায়, তার পরামর্শে একটুখানি অস্থায়ী রং ধরে সকলেরই মনে, আমার মনেও ধরেছিলো। পাঠ্যকেতাবের ফাঁকে-ফাঁকে কত যে নভেল গিলতুম তখন – যা-কিছু পাওয়া যেতো সেই ছোটো শহরে—হ্যাঁ, এমনকি—আপনি সাহিত্যিক, এ-কথা শুনে হাসবেন না—এমনকি—কবিতাও পড়তুম। গল্পে, কবিতায়, যেখানেই ভালোবাসার কথা, সেখানেই আমার মনের খোরাক— আর এ কী রহস্য যে, এত লিখে-লিখেও ফুরোয় না, যত তার কথা শুনি ততই আরো শুনতে ইচ্ছে করে।

আজ মনে হয় যে, ছাপানো বইতে কতবার তো ভালোবাসার কথা শুনেছিলুম, কিন্তু কিছুই শুনিনি, শুনেও শুনিনি। সেই সতেরো বছর বয়সে পাখির মুখে যখন শুনলুম, আকাশ ভ'রে বাঁশি বেজে উঠলো।

হ্যাঁ, সেই সুদূর সতেরো বছরে পাখি আমাকে ভালোবেসেছিলো। বলতে-বলতে এখন মনে পড়েছে তাকে, যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কালো দুটি চোখ। চোখে-

চোখেই ভালোবাসার জন্ম, চোখে-চোখেই তার জীবন—সেই ঘোরতর ব্যাকওঅর্ড-সেকালে আর-কোনো ভাষা আমাদের জানা ছিলো না। সকলের সঙ্গে সকলের কথাবার্তার মধ্যে আমি ব'সে থাকতুম, সে-ও থাকতো—মনেই করতে পারি না যে, দু-জনে সোজাসুজি কখনো কিছু বলেছি। হয়তো সেও একরকমের বলা, তখনকার খিদে তাতেই মিটে যায়। অন্তত আমাদের ওর বেশি আশা ছিলো না, বেশি কোনো আশার স্ফুরণও ছিলো না।

সেই পাখির মুখে একদিন কথা ফুটলো—এক রাত্রে, আজকের মতোই এক শীতের রাত্রে।

রাত তখন তিনটে হবে। কল্পনা করুন মফস্বলের শহর, শহরের প্রান্তে প্রকাণ্ড মাঠের মধ্য দিয়ে রাস্তা, চারদিকে কুয়াশা, আর সেইসঙ্গে আকাশে একটা তোবড়ানো চাঁদের ফ্যাকাশে জ্যোছনা। রেল-বাবুদের ক্লাবে নাটকের পালা হ'লো —সেখানকার মস্ত ঘটনা এটা—প্রায় প্রত্যেক বাড়ি থেকেই কেউ-না-কেউ এসেছে। উৎসাহ মহিলাদেরই, পুরুষরা বেশির ভাগ এসকর্ট* মাত্র। সেই সম্মানজনক পদ—যদিও নেহাৎ ছেলেমানুষ—শুধুই পুরুষজাতীয় জীব হবার জোরে সেই রাত্রে আমি পেয়েছিলুম। বড়োরা কেউ রাজি নন, আর আমি একটা আস্ত মানুষ বেকার ব'সে আছি—অর্থাৎ সামনেই কোনো পরীক্ষার তাড়া আমার নেই—অতএব আমাকেই পাকড়াও করলেন মা-বৌদির দল। আমার ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু জোর

ক'রে 'না' বলায় চাইতে যে কোনো অনিচ্ছায় কাজ আমার পক্ষে তখন সহজ ছিলো।

মেয়েরা তখনো চিকের আড়ালে বসেন, কিন্তু কণ্ঠস্বরের অবরোধপ্রথা কোনোকালেই তো ছিলো না। চোখে না-দেখলেও কানে শুনলুম তাঁদের—হাসাহাসি, গালগল্প, বসবার জায়গা নিয়ে ঝগড়া, নাটক বিষয়ে মন্তব্য, বাচ্চাদের উপর তর্জনগর্জন—সব মিলে এক বিচিত্র অদ্ভুত চ্যাঁচামেচি। চ্যাঁচামেচি স্টেজেও প্রচণ্ড পরিমাণে হচ্ছিলো ;—ঘুমে ঢুলতে-ঢুলতে আমার ব'সে-ব'সে মনে হচ্ছিলো, একসঙ্গে দুটো নাটক শুনচি—না, তিনটে, কেননা, একটু সামনের দিকে বসেছিলুম ব'লে প্রমটিংও স্পষ্ট শুনছিলুম, আর দ্রৌপদী আর ভীমসেনকে সিগারেট ফুঁকতেও দেখা যাচ্ছিলো মাঝে-মঝে। এই তিন-মিশেলি গোলমাল চলেছে তো চলেইছে, কখনো থামবে এমন মনেই হয়না—এক-এক বার আমি ব'সে-ব'সেই ঘুমিয়ে নিচ্ছি খানিকটা—তবু সেই নাটক কি ফুরোয় !

শেষ পর্যন্ত সত্যি যখন শেষ হ'লো, সবাই বললো গ্র্যাণ্ড সক্সেস, অনেকের মনে এটুকু শুধু আপশোষ থাকলো যে, নেহাৎই মাঘ মাসের রাত ব'লে একদম ভোর ক'রে দেয়া গেলো না।

এবার বাড়ি ফেরার পালা। যান-বাহনের বালাই নেই, দল বেঁধে-বেঁধে হাঁটতে লাগলো সকলেই। কিছু দূর পর্যন্ত

সকলেরই এক রাস্তা, প্রায় সকলেই সকলের চেনা, তাই মহিলা-দের কলধ্বনি তেমনি চললো অবিরাম—যেন নাটক শেষ হ'য়েও শেষ হয়নি, পিছন-পিছন তাড়া করেছে। হঠাৎ জজ-সাহেবের মটরটি ফটফটিয়ে চ'লে গেলো, আর তারপরেই—আমার মনে হ'লো—চারদিক যেন চুপ, ঠাণ্ডা, মরা জ্যোছনায় ছড়িয়ে প'ড়ে আছে মাঠের পরে মাঠ, কোনটা গাছ আর কোনটা তার ছায়া ঠিক ঠাহর হয়না, মানুষ যারা চলেছে, তাদেরও ছায়া ব'লে ভুল হয়—আর একটু পরে কাছাকাছি অন্য মানুষও নেই, আমি একাই হেঁটে চলেছি। তখন বুঝলুম যে, সঙ্গিনীদের ছাড়িয়ে অনেকটা এগিয়ে এসেছি—বোধ-হয় শীতের জন্য তাড়াতাড়ি হাঁটছিলুম, ভালো লাগছিলো হাঁটতে। খানিক আগেও ঘুমে এলিয়ে ছিলুম, কিন্তু এখন আমার চোখে ঘুমের ছিটেফোঁটাও নেই—সেই মস্ত খোলা মাঠের মধ্যে, কুয়াশার রাত্রে আমার মনে হ'লো, শরীরের অণুতে-অণুতে আমি জেগে আছি, বেঁচে আছি।

কিন্তু বড্ড বেশি এগিয়ে এলুম না তো? কর্তব্যপালনে ত্রুটি হচ্ছে কি? অবশ্য, নতুন-গোঁফ-ওঠা একটা মোটা গলার ছেলে পাশে-পাশে থাকলে কোনো লাভ নেই ওঁদের, বরং তাতে অসুবিধেই, তবু—যদি-বা কোনো দরকার হয়!

নিশ্বাস নিয়ে দাঁড়ালুম, পিছনে তাকালুম। মহিলাদের দল অনেকটা পিছনে, কুয়াশায় চোখেই পড়েনা। কিন্তু মনে হ'লো কে একজন খুব তাড়াতাড়ি হেঁটে আমার দিকে

আসছে। কে? একটি মেয়ে। নিশ্চয়ই মা-র কোনো শাসন, কি বৌদির কোনো ফরমাশ?

কাছে আসতে দেখি, পাখি।

আমি বললুম, 'কী হয়েছে?'

'কী আবার হবে?'

'তবে?'

'তবে মানে?'

'তুমি যে?'

'মা-রা এত আস্তে হাঁটেন!'

এ-কথা শুনে আমি অবাক হয়েছিলুম মনে পড়ে। খুব সাহস তো!

জিগেস করলুম, 'ওঁদের বলেছো?'

'বলেছি।'

'কী বললেন ওঁরা?'

'কী আবার বলবেন!' পাখি মাথা ঝাঁকালো, আবছা-জ্যোছনায় নতুন ক'রে ওকে দেখলুম।

'তার মানে—'

আমার কথায় বাধা দিয়ে পাখি বললো, 'দাঁড়িয়েই থাকবে নাকি?'

এই প্রথম তার সঙ্গে মুখোমুখি কথা বললুম। মনটা হঠাৎ যেন খুব ভ'রে গেলো, যেন ভার, যেন বুকের মধ্যে ভারি কিছু বাসা বাঁধলো।

আবার হাঁটতে লাগলুম, এবার পাশাপাশি দু-জনে। কিন্তু বাকি পথটুকু আর কথা না। জোরে হাঁটলুম আমি, পাখি একবারও বললো না 'আস্তে', ঠিক আমার সঙ্গে-সঙ্গেই চললো। সে তখন চোদ্দ বছরের—সে-যুগের হিশেবে মস্ত মেয়ে, এবং সে-যুগের হিশেবেও শান্ত। কিন্তু তখন তাকে একটুও শান্ত লাগলো না আমার ; মনে হ'লো তার পা দুটি অনেক, অনেকক্ষণ ধ'রে এমনি চলতে পারে আমার সঙ্গে—বাড়ি ছাড়িয়ে, শহর ছাড়িয়ে, হয়তো আমাদের চেনাশোনা ছোট্ট পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোথাও!

সেই ছেলেবয়সে বোকার মতো কত কথাই মনে হয়! হবেই-বা না কেন? ততক্ষণে ডিস্ট্রিক্ট-বোর্ডের বাঁধা শড়ক ছাড়িয়ে পায়ে-চলা মাঠের পথে নেমেছি, পায়ে-পায়ে চোর-কাঁটার খোঁচা—দুষ্টুমির আদরের মতো লাগছে, নিশ্বাস একটু ভারি, চারদিকে ঘাসের গন্ধ, শিশিরের গন্ধ, পৃথিবীর গন্ধ। এমনি খানিকক্ষণ যেন স্বপ্নের মধ্যে হাঁটলুম, তারপর মাঠ ফুরোলো, শহর, শহর সরু হ'লো পাড়ায়, ঘুমে-বোঝাই বাড়ি-গুলির পাশেই হঠাৎ একটা পুকুর চাঁদকে চুরি ক'রে ব'সে আছে। এর পরে একটি মোড় নিয়েই পাখিদের একতলা। পাশাপাশি বাড়ি আমাদের, বেজায় বন্ধুতা দু-বাড়িতে—সকলেই সকলের বন্ধু তখন, সকলেই সুখী—আমাদের এ-বয়সের এটাই সবচেয়ে বিশ্রী, যখন মনে হয় জীবনের সব সুখ পিছনে প'ড়ে আছে।

পিছনে তাকিয়ে অভিভাবিকাদের চিহ্ন দেখলুম না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলুম—জোরে নিশ্বাস পড়ছে, আর এতটা হাঁটার পরে শরীর বেশ গরম, যেন শীতের শেষরাত্রে—সবচেয়ে ঠাণ্ডা যখন, তখনই ফাল্গুনের হাওয়া দিচ্ছে।

একটু পরে বললুম, 'তুমি না-হয় বাড়ি যাও।'

'একটু দাঁড়াই।'

আমারও তা-ই ভালো মনে হ'লো। এতক্ষণ আর-কিছুই মনে ছিলো না, কিন্তু এই চেনা পাড়ায়, চেনা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে গুরুজনদের কথা আমার মনে পড়লো। হয়তো দোষ করেছি, বকুনি পাওনা আছে, সেই বকুনি মাথা পেতে নেবার জন্য পাখিকে নিয়ে এখানেই আমার দাঁড়িয়ে থাকা উচিত।

এবার কথা বললো পাখি।

'বাড়িটা আরো দূর হ'লে বেশ হ'তো।…তা-ই না?'

আমি বললুম, 'কিন্তু, পথ তো ফুরোতোই।'

পাখি একবার আমার দিকে তাকালো, জ্যোৎস্নায় চিকচিক ক'রে উঠলো তার চোখ। মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'এতক্ষণ কী ভাবছিলে তুমি?'

'কী জানি।'

'আমি ভাবছিলুম—ভাবছিলুম যে, হাঁটতে তো খুব ভালো লাগছে, কিন্তু হাঁটছি ব'লেই পথ ফুরোচ্ছে।'

এ-কথা শুনে আমার তখন হাসি পেয়েছিলো। কিন্তু এখন

মনে হয় যে, সেই চোদ্দ বছরের মেয়ে না-জেনে ঠিক জ্ঞানের কথাই বলেছিলো। জীবনটা এই রকমই আমাদের—বাঁচতে-বাঁচতেই বেঁচে থাকার ক্ষয়, যে-পথে চলতে ভালো লাগে, চলতে হয় ব'লেই সে-পথ ফুরোয়।

'আরো অনেক কথা ভাবছিলুম,' পাখি আবার বললো। 'কিন্তু বলবো না, তুমি হাসবে।'

'বলো না,' আমার কলেজে-পড়া বিজ্ঞতায় আমি যেন দয়া ক'রে তাকে অনুমতি দিলুম।

'না, বলতে পারবো না।'

'কেন?'

'ভুলে গেছি।'

'এর মধ্যে ভুলে গেলে?'

'এই রকমই তো হয় আমার। তোমাকে বলবো ব'লে কত কথাই ভাবি, বলতে গিয়ে কিছুই মনে পড়েনা।'

'মনে পড়েনা?'

'না। তোমাকে ভালোবাসি, তাই ও-রকম হয়। কথা ভুলে যাই।'

এ-কথা শুনে আমি কেঁপে উঠলুম। মুখ ফিরিয়ে নিলুম—যাতে ওর দিকে না-তাকাতে হয়—মোড়ে মহিলাদের দেখা গেলো।

বাঁচলুম যেন। এর পর পাখি আরো কী বলতো কে জানে। গুরুজনরা কি বকেছিলেন আগে চ'লে আসার জন্য?

মনে পড়েনা। কিছু কথা তাঁরা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোনো কথাই আমি শুনিনি। আমার সমস্ত শ্রবণশক্তিতে পাখির শেষ কথাটি ছাড়া আর-কিছুরই জায়গা তখন ছিলো না।

বাড়ি ফিরে বাকি রাতটুকু আর ঘুমোতে পারলুম না।

গগনবরন চুপ করলেন। অন্য তিন জন নিঃসাড়—তাঁরা শুনছিলেন কি শুনছিলেন না বোঝার উপায় নেই। কনট্র্যাক্টর তাঁর ওভারকোটের গলা কান পর্যন্ত তুলে দিয়েছেন, ডাক্তার কোমর থেকে পা ঢেকেছেন কম্বলে, চোখে ঘুমের ঢুলুঢুলু ভাব। সাহিত্যিকটি চেয়ারের পিঠে মাথা ঠেকিয়ে মুখ উঁচু ক'রে আছেন, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট পুড়ে যাচ্ছে, একটু পরে হাতটি যখন ঠোঁটে ঠেকালেন, তখন বোঝা গেলো জেগে আছেন। কিন্তু দিল্লির চাকুরে, শ্রোতাদের দিকে তাকালেন না, সামনের দেয়ালটাকে মন দিয়ে দেখলেন একটু, যেন ওখানে তাঁর গল্পের বাকি অংশ লেখা আছে। অতীতের অদৃশ্য লেখা—যা মানুষ ভুলে গিয়েও ভুলতে পারেনা—আস্তে তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠলো, মসৃণ ধীর স্বরে আবার বলতে লাগলেন।

আর-এক দিনের কথা মনে পড়ছে। এবারেও দিন না, রাত্রি। সেও জ্যোছনার রাত, কিন্তু শীতের কুয়াশা-মাখা জ্যোছনার বদলে, বৈশাখের পাগলের মতো পূর্ণিমা এবার। তখন কলকাতায় থাকি, এম. এস-সি.র বছর আমার। দাদা আগের

বছর কলকাতায় এসেছেন, আমি .হস্টেল ছেড়ে তাঁর শ্যামবাজারের বাড়িতে আছি। আর সেই বাড়িতেই পাখি এসে উঠেছে একদিনের জন্য—কার্সিয়ঙে তার স্বামীর কাছে যাবার পথে।

খুব ধুমধাম ক'রে পাখির বিয়ে হয়েছিলো। ম্যাথমেটিক্সে মাথা খাটিয়ে ততদিনে আমার নভেলিয়ানা কিছু কমেছে, তবু মনে হ'লো, পাখির বিয়েতে আমার কিঞ্চিৎ হার্টব্রেক না-হ'লে মানায় না। ওকে বিশ্বাসঘাতক কল্পনা ক'রেও মনে-মনে গর্জালাম, কিন্তু সত্যি বলতে একটুও কষ্ট হ'লো না আমারও, রাগও না, বইয়ের এন্তার বুলি সত্ত্বেও হৃৎপিণ্ড আমার অটুট থাকলো। তাতে আবার একটু নিরাশও হলাম, নিজের বিষয়ে ধারণা যেন নেমে গেলো, এবং—যতদূর জানতে পেরেছি—নতুন চাকরি-পাওয়া ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেটকে বিয়ে করার সময় পাখিও একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলেনি।

আপনারা ভাবছেন, দীর্ঘশ্বাসের কী আছে। ছেলেবয়সের ধরাধার্য অঙ্গ এ-সব—বয়স বাড়লে নিজেই সেরে যায়, এ নিয়ে আবার মাথা ঘামায় নাকি কেউ? হ্যাঁ, ছেলেমানুষি নিশ্চয়ই; পৃথিবীতে ছেলেমানুষ যতদিন আছে, ততদিন ও-বস্তুটাও বাদ যাবেনা; আজ বুড়ো হ'য়ে যে যাই বলি, ওটাও উড়িয়ে দেবার নয়। হ্যাঁ—সত্যি কথাই, বিয়ের কথা কেউ আমরা ভাবিনি, এই আমাদের এখনকার চেনাশোনার বাইরে এর আর ব্যাপ্তি নেই—এ-ই আমরা মনে-মনে ধ'রেই নিয়েছিলুম। কিন্তু

তাই ব'লে কি একে শস্তা মাল বলবো, ভেজাল, বাজে? তা-ই যদি হবে, তাহ'লে এত বছর পরে আজ এই অস্থানে অসময়ে পাখিকেই আমার মনে পড়লো কেন?

কলকাতায় তার আত্মীয়বাড়ির অভাব ছিলো না; কিন্তু বেছে-বেছে আমাদের ওখানেই উঠলো। কেন, কখনো আমি নিজের মনেও প্রশ্ন করিনি। বৌদি খুব ভালোবাসতেন ওকে, আমাদের বাড়ির সকলকেই ও ভালোবাসতো—এর বেশি কোনো কারণ, কোনো অন্য, সত্য কারণ যদি-বা থাকে, তাকে মেনে নেবার সাহস আমার ছিলো না।

না, সাহস ছিলো না। পাখি এসে পৌঁছলো বিকেলবেলা, আমি শুধু তাকে চোখেই দেখলুম একবার—'কী, কেমন আছো?' এইটুকুই শুধু কথা হ'লো। তারপর থেকেই সে অন্যদের দখলে, বাড়ির সকলের, বিশেষত মেয়েদের, কেননা যে-মেয়ের নতুন বিয়ে হয়েছে তার মতো ইন্টারেস্টিং জীব অন্য-সব মেয়েদের কাছে আর নেই, হোক বয়স সাত কিংবা সাতাশি। সন্ধের পরে জ্যোছনার বারান্দায় পাটি পেতে সবাই বসলো, আমি আস্তে বেরিয়ে গেলুম হস্টেলে আড্ডা দিতে। প্রায়ই আড্ডা দিই; কিন্তু মনে পড়ে সেদিন কত ভালো লেগেছিলো—বন্ধুরা সকলেই যেন প্রাণের বন্ধু, আর তারা সবাই একবাক্যে বললো, আজকের মতো ফুর্তি আমায় কখনো তারা ছাখেনি। ফুর্তি? জানি না তার কী নাম দেবো। আনন্দ—হ্যাঁ, একরকম বুক-কাঁপানো ভয়-

জাগানো অদ্ভুত আনন্দ। কৃপণ যেমন তার রত্ন কখনো ভুলতে পারেনা, তার যে নিশ্চিত লুকোনো রত্ন আছে সে-কথা ভেবেই সুখ পায়, এও তেমনি, কিন্তু তফাৎ এই যে, কৃপণের সর্বদা ভয় পাছে হারায়, আর আমার ভয় পাছে দেখি, দেখা হয়, হাতে পাই। তাই বাড়ি ফেরার পথে সারাক্ষণ আমার বুক দুরদুর করলো, সুখে, আশায়, আশঙ্কায়, আনন্দে।

আশ্চর্য সেই বৈশাখের জ্যোছনা।

খাওয়ার পরে আমি নিজের ঘরে বসলুম। বৌদিরা আবার বারান্দায় জমলেন ; ব'সে-ব'সে তাঁদের গলা শুনছিলুম, হাসি, পাখির নরম গলার হাসি শুনছিলুম। ক্রমে রাত বাড়লো, কথা ক'মে এলো। আমি টেবল-ল্যাম্পের সামনে মস্ত মোটা বই খুলে ব'সে আছি। সত্যি পড়ছি, অন্তত চেষ্টা করছি, পাতাও ওল্টাচ্ছি মাঝে-মাঝে—কিন্তু কী পড়েছিলুম, বইটাই-বা কী, পরের দিন সকালবেলা তার বিন্দুবিসর্গও আমার মনে ছিলো না।

রান্নাঘরের দিকে চাকরদের শব্দ থামলো, বারান্দার আড্ডা ভাঙলো, ব'সে ব'সে শুনলুম ওঁদের খশখশ চলাফেরা, ছিটকিনি বন্ধ করার ছোট্ট আওয়াজ। রাস্তার গোলমালও ক'মে এসেছে ততক্ষণে, রাত নিঝুম, কিন্তু আমি বই খুলে চুপ ক'রে ব'সেই আছি।

হঠাৎ এক সময় দেখি পাখি, আমার টেবিলের ধারে

দাঁড়িয়েছে। যে-মুহূর্তে তাকে চোখে দেখলুম সে-মুহূর্তে বুঝলুম যে, এরই জন্য আমার এতক্ষণ ব'সে থাকা। হ্যাঁ—লুকোবার চেষ্টা ক'রে লাভ নেই—এরই জন্য। মনে হ'লো আমি আমার অসম্ভব ইচ্ছা দিয়ে তাকে এখানে ডেকে এনেছি, না-এসে তার উপায় নেই, না-এসে সে পারেই না। তাই আমি অবাক হলুম না, কোনো কথা বললুম না, চুপ ক'রে শুধু তাকিয়ে থাকলুম।

সেদিন তাকে কেমন দেখেছিলুম? সেই চোদ্দ বছরের ছিপছিপে মেয়ে, আর এই উজ্জ্বল বিবাহিতা তরুণী—এ-দুয়ের কোনো তুলনা হয় নাকি? আজ তার পরনে নীল রেশমের শাড়ি, কত রকম গয়না—ঐ গয়না জিনিশটা দু-চক্ষে দেখতে পারি না কোনোদিন, কিন্তু সেদিন—সেদিন যেন মনে হয়েছিলো, মন্দ না—অন্তত কোনো-কোনো মানুষকে কখনো-কখনো মানিয়ে যায়।

প্রথম কথা বললো পাখি। সেই কথাটা স্পষ্ট আমার মনে আছে।

'আমি একজন ভদ্রমহিলা। আমাকে দেখে তোমার উঠে দাঁড়ানো উচিত।'

আমি বাধ্যভাবে উঠে দাঁড়ালুম।

'এত রাত জেগে বই পড়ছো?'

উত্তরে আমি পাতা-খোলা মোটা বইটার দিকে একবার তাকালুম শুধু।

'শুধু কি বই পড়ার জন্যই জেগে ছিলে ?'

এবার অপরাধীর মতো মাথা আমার নিচু হ'লো। একটু কাটলো চুপচাপ। পাশের ঘরের দেয়াল-ঘড়ির টিকটিক শুনলুম; আর একটা শব্দ, বোধহয় আমারই বুকের ভিতরে আওয়াজ দিচ্ছিলো—ভারি অদ্ভুত সেটা।

পাখি আবার বললো, 'বিলেত যাচ্ছো শিগগিরই ?'

'কথা তো হচ্ছে।'

'কতদিন থাকবে ?'

'অন্তত দু-বছর—বেশিও হ'তে পারে।'

'কবে রওনা হবে ?'

'সেপ্টেম্বরে।'

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে এইটুকু শুধু কথাবার্তা হ'লো আমাদের, তারপর আবার চুপচাপ। অনেকবার আমার ইচ্ছা হ'লো তার দিকে তাকাই, মুখোমুখি, সোজাসুজি ভালো ক'রে তাকে দেখি—কিন্তু জানি না কিসের লজ্জা আমাকে বাধা দিলো; আমি মুখ ফিরিয়ে থাকলুম, শুধু মনে-মনে জানলুম, সমস্ত মন দিয়ে জানলুম যে সে এখানেই আছে—আমার কাছে, এত কাছে, কিন্তু একটু পরেই আর থাকবে না।

হঠাৎ পাখি ঘুরে এসে আমার সামনে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো।

'শোনো'—

আমি মুখ তুলে তার দিকে তাকালুম। তার মুখ গম্ভীর, প্রায় কঠোর। তার গলার তলায় ছোটো গর্তটিতে নিশ্বাসের

ওঠাপড়া আমার চোখে পড়লো, চারদিক এমন চুপচাপ, আর সে আমার এত কাছে দাঁড়িয়েছে যে, সেই নিশ্বাসের শব্দ আমি প্রায় শুনতে পেলুম।

'জীবনে বড়ো হ'তে হবে তোমাকে,' হঠাৎ পাখির গলা শুনলুম। 'আর রাত জেগে শরীর নষ্ট কোরো না। শুয়ে পড়ো, আমি যাই।'

আমি বোধহয় কিছু বলতে চেষ্টা করলুম, কিন্তু কোনো কথাই গলা দিয়ে বেরোলো না।

'তোমার আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যাই।'

আমি দেখলুম তার একটি হাত আমার টেবল-ল্যাম্প ছুঁলো, আর মুহূর্তে যেন অন্য এক জগতে বদলি হলুম। নীলচে জ্যোছনা জেগে উঠলো ঘরে, ঘর আর ঘর থাকলো না, তার শাড়ির নীল প্রায় কালো দেখালো, আর হঠাৎ সে একটু নড়তেই তার চোখ দুটি চাঁদের আলোয় চিকচিক ক'রে উঠলো, আর ঠোঁট যেন জ্যোছনার তুলিতে আঁকা হ'য়ে থাকলো। এক মুহূর্ত তাকে দেখলুম, ও-রকম, আর তারপর তার লম্বা, নরম, প্রবল, কঠিন বাহু দুটি আমাকে জড়িয়ে ধরলো, আমাকে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধ'রে ঠোঁটের উপর বার-বার সে চুমু খেলো, আমার চোখ অন্ধ হ'লো, নিশ্বাস বন্ধ হ'লো, মনে হ'লো মৃত্যুর পূর্বস্বাদ ভোগ করছি।

তারপর স'রে গিয়ে বললো, 'এর বেশি তোমাকে আমি দিতে পারিনা।'

ব'লে চ'লে গেলো। সে-রাত্রেও আমি আর ঘুমোতে পারলুম না।

গগনবরন আবার থামলেন। পেয়ালায় কফি ঢালতে গিয়ে নিরাশ হলেন—আর নেই, যতটা ছিলো অনেক আগেই শেষ হয়েছে। একটি সিগারেট নিয়ে ধরালেন—বোধহয় সিগারেটের খুব তেষ্টা পেয়েছিলো—বুক ভ'রে নিশ্বাস নিয়ে আস্তে-আস্তে বের করতে লাগলেন মুখ দিয়ে।

সাহিত্যিক ন'ড়ে উঠে বললেন, 'তারপর?'

দিল্লিওলা একটু যেন চমকালেন অন্য কারো আওয়াজ শুনে, যেন অপ্রস্তুত হলেন। কী দুর্মতি তাঁর হয়েছিলো, এই গল্প ফেঁদে বসার! যাকগে—কী-বা এসে যায়—এঁদের কারো সঙ্গে আর তো দেখা হবেনা জীবনে। মনে-মনে চেষ্টা করলেন তাঁর বর্তমান বাস্তব-জীবনে ফিরে যেতে; দিল্লি, চাকরি, তাঁর স্ত্রী, ছেলেমেয়ে, এ-সব কথা মনে আনলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ও-সব তেমন জরুরি ব'লে বোধ হ'লো না—এতক্ষণ যা বলছিলেন তারই প্রতিধ্বনিতে মন যেন ভ'রে আছে।

সিগারেটটি বাঁ হাতে ধ'রে আবার তিনি আরম্ভ করলেন:

তারপর আমি বিলেত গেলুম, ফিরে এলুম, চাকরি, বিয়ে, ছেলেপুলে, সংসার, চাকরিতে ধাপে-ধাপে উন্নতি, অজান্তে বয়স বেড়ে চলা—হ্যাঁ, যতই যত্ন নাও শরীরের, ভালো থাকো,

ভালো খাও, কথায়-কথায় ডাক্তারের কাছে, ডেন্‌টিস্টের কাছে ছোটো, সময় হ'লে বুড়ো হ'তেই হয়, কারো নিষ্কৃতি নেই। আমারও চুল পেকেছে, যদিও হঠাৎ চোখে পড়েনা, কিন্তু কতদিন আর লুকোনো থাকবে—এবং আমি লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করি যে, শুভ্রকেশে আমি কিছুমাত্র গৌরবের বিষয় দেখতে পাইনা—তার আগেই যারা ধরাধাম থেকে বিদায় নেয় তাদেরই বরং ভাগ্যবান মনে হয় আমার।

অর্থাৎ, সংসারের হাজার-হাজার মানুষের জীবন যেমন বাঁধা-ধরা মামুলিভাবে চলে, আমারও তা-ই চলছিলো। পাখির সঙ্গে আর দেখা না-হ'লে ক্ষতি ছিলো না, না-হ'লেই এই গল্পের দিক থেকে মানাতো ভালো ;—কিন্তু ঐ রোমাণ্টিক অধ্যায়টিকে কিছুমাত্র সম্মান না-ক'রে ছেড়ে-ছেড়ে অনেক বছর পর-পর আবারও কয়েকবার দেখা হ'লো। নিতান্তই সাধারণ, সংক্ষিপ্ত সে-সব দেখাশোনা। ক্রমশই সে মোটা হচ্ছে, বড্ড পান খায়, খুব হাসিখুশি, খুব সুখে আছে, ছেলেমেয়ে ইত্যাদি নিয়ে সংসারে মসগুল একেবারে। একবার তার মেয়েকেও দেখলুম—বড়ো হচ্ছে—হঠাৎ মনে হ'লো মেয়েটি যেন তার মা, সেই অনেক, অনেকদিন আগে ছেলেবেলায় সে যেমন ছিলো।

সেই মেয়ের বিয়েতেই শেষ তাকে দেখেছিলুম—বছর-তিনেক আগে। কলকাতার মধু রায়ের গলিতে বিয়ে। আমাকে দিল্লিতে ছাপানো চিঠি পাঠিয়েছিলো—সঙ্গে আমার

স্ত্রীকে দু-লাইন, "ভাই, তোমরা কোনোরকমে আসতে পারলে কতই-না সুখী হতাম!" আমার স্ত্রীর সঙ্গেও তার দেখা হয়েছে দু-একবার—তিনি কনভেন্টে-পড়া মেয়ে, পাখিকে গ্রাম্য লেগেছিলো, কিন্তু পাখি আমাকে ওরই মধ্যে এক ফাঁকে বলেছিলো 'ওঃ, তোমার স্ত্রীভাগ্য খুব!'

ঠিক সেই সময়টায় একবার সরকারি কাজে কলকাতায় আসতে হ'লো আমাকে। ঐ বিয়ের নেমন্তন্নে যাবো কি যাবো না ভাবতে-ভাবতে শেষপর্যন্ত গেলুম। কলকাতা অনেকদিন ধ'রে বিদেশ হ'য়ে গেছে আমার কাছে, দু-একদিনের জন্য আসি, হোটেলে থাকি, সিনেমা দেখে সন্ধ্যা কাটাই, সরকারি লোকজন ছাড়া কারো স[illegible]ই দেখা হয়না। এবার অন্য কিছু আছে, রাইটার্স-বিল্ডিঙের বাইরে যাবার জায়গাও আছে কোথাও—ভাবতে নেহাৎ মন্দ লাগলো না। তারিখটা মনে ছিলো—ভাবলুম বিয়েবাড়ির ভিড় জ'মে ওঠার আগে সন্ধেবেলা সেরে আসি। সঙ্গে ধুতি নেই—ধুতির পাটই আমার নেই আজকাল, অগত্যা বেমানান বিলিতি বেশেই রওনা হলুম।

ভবানীপুরে মধু রায়ের গলি বের করতে বেশ সময় লাগলো। কলকাতা কত বদলেছে আর পথঘাটও যেন ভুলে গেছি। উপহার স্বরূপ একটি বেনারসি শাড়ি হাতে ক'রে বিয়েবাড়ির দরজায় পৌঁছলুম সন্ধে পেরিয়ে। আলো, শামিয়ানা, শানাই, অতিশয় সাজগোজ-করা ছেলেমেয়ে, ভিতর থেকে লুচিভাজার ক্ষীণ গন্ধ—এই খাঁটি স্বদেশী আবহাওয়ার

সামনে কতকাল পরে দাঁড়ালুম। একটু বাধো-বাধো লাগলো, যেন আমি এখানে মানাই না, কিন্তু ঠিক তখনই আমার সম্পূর্ণ অচেনা একটি যুবক 'আসুন আসুন' ব'লে আমাকে আহ্বান করলো।

আমি বললুম, আমার নাম অমুক, দিল্লি থেকে এসেছি, ভিতর থেকে একবার কাউকে—

একটু পরে বছর-পনেরোর একটি ছেলে এসে আমাকে উপরে নিয়ে গেলো। আন্দাজে বুঝলুম, পাখির ছেলে।

আমাকে দেখে পাখি উচিতমতো অবাক হ'লো, এবং প্রায় অনুচিতরকম খুশি হ'লো। দু-একটা কথার পর আমি বললুম, 'আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকবো না।'

'আচ্ছা আচ্ছা, বেশি দেরি করিয়ে দেবো না!'

একটা কোণের ঘরে একলা আমাকে বসিয়ে রেখে পাখি উধাও হ'লো। কিন্তু বেশিক্ষণ একা থাকলুম না আমি, আমার কোনো-এককালের চেনাশোনা গুরুজন-স্থানীয় যাঁরা, একে-একে তাঁরা এসে দাঁড়ালেন। বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, দাঁত প'ড়ে গেছে, মাথায় চুল নেই, চোখের দৃষ্টি কারো-কারো ঘোলাটে। যেন এক জন্মান্তর পেরিয়ে এঁদের দেখলুম। আস্তে-আস্তে আমার সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করলেন এঁরা—ভাবটা একটু লজ্জার মতো, কিন্তু এতকাল পরে আমাকে দেখে এঁদের ভালো লাগছে তা স্পষ্ট বুঝলুম। আমারও ভালো লাগলো। এঁরা আমাকে ছোটো দেখেছিলেন, ছেলেমানুষ দেখেছিলেন—এ-রকম মানুষ আর

কতকাল থাকবে এই পৃথিবীতে, এর পর শুধু তাদেরই পালা, যাদের কাছে আমি বয়স্ক, বুড়ো, বড়ো-জোর সমবয়সী। এই পারিবারিক মহলে আমি যেন খানিকক্ষণ বছরের ভার ভুলে থাকলুম; অবাক হলুম এইটে দেখে যে, এঁদের সঙ্গে আলাপ করা আমার পক্ষে কঠিন হ'লো না। 'উনি কোথায়?' 'সে কেমন আছে?' 'অমুকের খবর কী?' এই সব হ'তে-হ'তে আরো কথা মনে পড়লো, পুরোনো কথা, দু-একটা হাসির কথা—কখনো ভাবিইনি এত কথা এখনো মনে আছে।

বেশ খানিকক্ষণ পরে পাখি আবার দেখা দিলো। হাতে প্রকাণ্ড থালা, মালার মতো বাটি সাজানো। আরে সর্বনাশ! 'না, না, কিছু শুনবো না, খেতেই হবে।' বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও যোগ দিলেন তাতে, আমি প্রায় নববধূর মতো অধোবদনে একটু-একটু ক'রে খেতে লাগলুম, শেষ পর্যন্ত অনেকটাই খেয়ে ফেললুম।

যা ভেবেছিলুম তার চেয়ে অনেকটা বেশিক্ষণ থাকা হ'য়ে গেলো। যার বিয়ে তাকে দেখলুম, নিজের কেনা শাড়ির সুখ্যাতি শুনলুম, চারদিক থেকে কত সব ছেলেমেয়ে এসে জুতো ছুঁয়ে টিপটিপ পেন্নাম ঠুকলো। শেষটায় মনে হ'লো যে, যতটা আত্মীয়তার আবহাওয়া এই দু-ঘণ্টায় এখানে ভোগ করা গেলো, তাতে আমার বাকি জীবন অনায়াসে কুলিয়ে যাবে।

এর পর যখন বর আসার সময় হ'লো, সারা বাড়ি

চঞ্চল, নতুন ক'রে শানাই বেজে উঠলো, আমি তখন বিদায় নিলুম। পাখি আমাকে এগিয়ে দিতে দরজা পর্যন্ত এলো, পিছন-পিছন আরো দু-একজন। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে এইরকম কিছু কথাবার্তা বোধহয় হ'লো।

'যাক, তবু আবার দেখা হ'লো তোমার সঙ্গে।'

'হ্যাঁ। বিয়ের আসরে থাকতে পারলুম না, কিছু মনে কোরো না।'

'কালই ফিরে যাচ্ছো?'

'কালই।'

'এটা নাও,' ব'লে পাখি আমার হাতে একটা বিস্কুটের টিন দিলো।

'কী? বেশ ভারি মনে হচ্ছে।'

'তোমার বৌ, ছেলেপুলের জন্য কিছু মিষ্টি। নিয়ে যেয়ো কিন্তু।'

'বাঃ! নেবো না! বাংলার মিষ্টি ভারতবিখ্যাত। জগতে এর জুড়ি নেই। ওরা খুব খুশি হবে।'

'সকলকে নিয়ে একবার বেড়িয়ে যাও না কলকাতায়।'

'হ্যাঁ—দেখি—যা চাকরি—আচ্ছা, চলি—'

আমি পিছন ফিরতেই মন্তব্য শুনলুম—বোধহয় ঠানদি-স্থানীয়া কোনো-একজনের—'আরে, তোমার চুল পেকেছে দেখছি!'

আমি ঠাট্টার সুরে লাগসইরকম কিছু বলতে যাচ্ছি, এমন

সময় পাখি আস্তে আমার ঘাড় ছুঁয়ে বললো, 'হ্যাঁ—আমাদের গগনবরন—তারও চুল পাকলো !'

কথাটা কিছুই না, ঘটনাটা কিছুই না, কিন্তু ঐ কথাটা যেমন ক'রে সে বলেছিলো তা কি আমি কখনোই ভুলবো ! না। ঐ কথায়, আর তার হাতের একটুখানি ছোঁওয়ায় সেদিন আমি স্পষ্ট বুঝেছিলুম যে, পাখি আমাকে এখনো ভালোবাসে—ভালোবাসা কাকে বলে তাও বোধহয় মুহূর্তের জন্য তখনই শুধু বুঝেছিলুম।

রাস্তায় এসে শানাইয়ের সুরে মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গেলো।

'বেশ গল্প ! বে—শ !' ফোঁশ ক'রে অনেকখানি নিশ্বাস ছেড়ে কনট্র্যাক্টর তারিফ করলেন।

সাহিত্যিক বললেন, 'কিন্তু উপদেশটা স্পষ্ট। যাকে হারালে তাকেই পেলে এই আরকি কথাটা। ভালোবাসা আছে দূরে, অন্য কোথাও, হয়তো সেটা শুধু ইচ্ছা, কল্পনা—বাস্তবে আদৌ নেই। এই মতটা পুরাকাল থেকে অনেকেই প্রচার করেছেন—আমি একদম মানি না।'

'আমি দেখুন কোনো মতামত জানি না', দিল্লিওলা বললেন, 'এ-সব বিষয়ে ভাবিও না কোনোদিন। খেয়ে-প'রে আরামে থাকবো—এর বেশি আমার কোনো মত নেই।'

'সে-বিষয়ে আমরা সকলেই একমত,' কনট্র্যাক্টর হাসলেন।

'কিন্তু আপনারা দু-জনেই দুঃখের গল্প বললেন,' একটু হেসে টিপ্পনি কাটলেন ডাক্তার। 'এবার একটা মজার গল্প শুনুন।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!'

'আমার বিয়ের গল্প। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ ক'রে নেহাৎই যাদের অকালমৃত্যু না হয় তাদের—ঠিক সকলেরই না হোক, অধিকাংশেরই কোনো-না-কোনো সময় কারো-না-কারো সঙ্গে বিয়ে হয়ই; ঘটনাটায় অসাধারণ কিছু নেই। তবু—আমার বিয়েতে একটু মজাই হয়েছিলো—গল্পটা নেহাৎ মন্দ না।'

'ভণিতা থাক। বলুন।'

ডাক্তার আরম্ভ করলেন :

অবনী ডাক্তারের বিয়ে

মাত্র বছরখানেক যখন প্র্যাকটিসে বসেছি তখনই আমার বিয়ে হ'লো। এত শিগগির বিয়ের কথা ভাবিনি। ধর্মতলায় চেম্বর নিয়েছি, টেলিফোন আছে, ছোটো একখানা গাড়িও আছে, কিন্তু প্র্যাকটিস তখনো কিছুই না। মনে-মনে হিশেব ক'রে দেখেছি যে, বাবা তাঁর একমাত্র পুত্রের জন্য যা রেখে গেছেন তাতে বছর-পাঁচেক চালাতে পারবো—আর ততদিনে যদি প্র্যাকটিস জমাতে না পারি তবে ধিক্ আমার জীবনে।

ভেবে রেখেছিলুম যে, মাসে অন্তত হাজারখানেক নিজস্ব রোজগার যতদিন না হয় ততদিন বিয়ের কথা ভাববোই না।

যারা সব ষাট টাকায় একটি চাকরি হবার সঙ্গে-সঙ্গেই টোপর প'রে বর সাজে, তাদের দেখে আমার বুক কাঁপে। বিয়ে তো হ'লো—তারপর ছেলেপুলে, অসুখবিসুখ, স্ত্রীর মরজি, নিজের ইচ্ছে—এ-সব? আর এ-সব যদি মেটে তাহ'লে ওতে কেবলই খিটিমিটি, বুক-জ্বলুনি, টানাহেঁচড়া। আমি ওর মধ্যে নেই। এইরকমই ভেবেছিলুম, কিন্তু হ'য়ে পড়লো অন্যরকম।

আমার পাশ ক'রে বেরোবার বছর মা-ও স্বর্গতা হয়েছিলেন, সংসারে কোনোই টান ছিলো না আমার। অবিবাহিত যুবক ডাক্তাররা সাধারণত একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়, আমার মতো নিরঙ্কুশ অবস্থায় উচ্ছন্নে যাবার কোনো বাধা ছিলো না। কিন্তু আমি নিজেকে সামলে নিয়েছিলুম কোনো অসামান্য চরিত্রবলে নয়, বড়ো ডাক্তার হবার অদম্য উচ্চাশায়। রাত্তিরে খাওয়ার পর বারোটা-একটা অবধি পড়াশুনো করি, ডাক্তারি বই প'ড়ে ক্লান্ত হ'য়ে বিছানায় যাই একটি নভেল নিয়ে, আবার ঘুম ভেঙে বিছানা ছাড়বার আগে শুয়ে-শুয়ে খানিকক্ষণ নভেলটি পড়ি। এই অভ্যেসটি তখনো আমার ছিলো, কিন্তু বেশিদিন আর থাকলো না।

এখন সে-কথা ভাবলে আমার হাসি পায়, কিন্তু বিয়ের দিন সকাল থেকে আমার বুকের ভিতরে ধুকপুক করেছে। বীণাকে কতদিন ধ'রে কত বিভিন্ন অবস্থায় দেখেছি, প্রথমে সজনে ও পরে বিজনে কত গল্প করেছি তার সঙ্গে, কিন্তু

যখনই ভেবেছি ও আমার স্ত্রী হবে, আমার বাড়িতে থাকবে, আমারই বিছানায় শোবে, আমার জীবনের উপর কর্তৃত্ব আমার চেয়েও বেশি হবে ওর—আর এ-রকম চলবে দু-চার মাস না, দু-চার বছরও না, সমস্ত জীবন—এ-কথা যখনই ভেবেছি তখনই কুঁজোর ধারে গিয়ে এক ঢোক জল খেয়েছি, নয়তো খানিক পায়চারি করেছি ঘরের মধ্যেই।

হ্যাঁ, সেদিন বড্ড নার্ভাস লেগেছিলো আমার। কিন্তু শেষের কথা আগে বলা হ'য়ে যাচ্ছে। প্রথম থেকে বলা যাক।

বীণাকে প্রথম যেদিন দেখেছিলুম সে-কথা মনে পড়ছে। একদিন সকালবেলা সেজেগুজে রোগীহীন চেম্বারে ব'সে আছি, হঠাৎ রমেনের টেলিফোন পেলুম। 'ওহে, এক্ষুনি একবার আসতে পারো?'

'কী ব্যাপার?'

'একটি মেয়ের পা কেটে গিয়ে ফুলে উঠেছে—বড়ো কষ্ট পাচ্ছে—'

আমি হেসে বললুম, 'তার জন্য ডাক্তারকে সশরীরে আসতে হবে? বোরিক কমপ্রেস দাও—সেরে যাবে।'

'না না, হয়েছে কী—মেয়েটির খুব শিগগির সেরে ওঠা চাই, নয়তো আমাদের রিহার্সেল এগোতে পারছে না।'

'রিহার্সেল? কিসের?'

'বাঃ, জানো না—"নব নীড়" নাটকের অভিনয় হচ্ছে।'

'নব নীড়' নামে একটা উপন্যাস কয়েকদিন আগেই

পড়েছিলুম, তখনকার নামজাদা শৈলেশ দত্তর বই। তা-ই থেকে নাটক হচ্ছে? জিগেস ক'রে জানতে পারলুম যে তা-ই। শৈলেশবাবুই উপন্যাস থেকে নাটক করেছেন, অভিনয়ও তিনিই করাচ্ছেন—যে-মেয়েটির অসুখ সে তাঁরই শ্যালিকা। তার পার্টটাই আসল, অথচ বেচারা পায়ের ব্যথায় ভালো ক'রে দাঁড়াতেও পারছে না। তাই আমি যেন চটপট আসি, এবং চটপট অসুখ সারিয়ে দিই। শৈলেশ দত্তর বাড়িতেই—রমেন লেক রোডের একটা ঠিকানা দিলো—তখন কলকাতায় লেক নতুন, লেক রোড সবেমাত্র খুলেছে।

আমি রমেনকে জিগেস করলুম, 'তুমি ওখানে কী করছো?'

'আমিও আছি তাঁদের সঙ্গে।'

'সাহিত্যিকদের সঙ্গে আবার হবনব করছো কবে থেকে?'

'সব রকম লোকের সঙ্গেই আলাপ রাখতে হয়···এসো কিন্তু,' ব'লে রমেন টেলিফোন ছেড়ে দিলো।

রমেন আমার খুব বন্ধু ছিলো তখন। অদ্ভুত লোক সে। মেডিকেল কলেজের প্রথম দু-বছরেই সে বুঝতে পেরেছিলো যে, ডাক্তারি পরীক্ষা পাশ করা তাকে দিয়ে হবে না। ছেড়ে দিয়ে ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে চশমার দোকান খুললো। সে-দোকান উঠে এলো চৌরঙ্গিতে, বিলেতি ডিগ্রিওলা চোখের ডাক্তার বসেন সেখানে, কাউন্টারে দাঁড়াবার জন্য একটি ফিরিঙ্গি মেয়ে ও রাখলো। তার ব্যবসা এতটা ফেঁপে উঠবে আমরা কেউ ভাবিনি, একটু অবাকই হয়েছিলুম। পার্থিব মূলধন তার

বিশেষ ছিলো না, কিন্তু একটি দৈব মূলধন ছিলো—সে তার চেহারা। অমন সুন্দর চেহারা বাঙালির মধ্যে কমই হয়। ছ'ফুট লম্বা, ফুটবলের সেণ্টারফরওঅর্ডের মতো লিকলিকে শরীর, হলদে-লালে মেশা গায়ের রং, ঘন কোঁকড়া কুচকুচে চুল। ঐ চেহারার জোরেই—আমার মনে হয়—জীবনে তার উন্নতি। অবশ্য মাঝে-মাঝে ছোটোখাটো বিপদেও পড়ে—ঐ চেহারারই জন্য। একবার এক ফিরিঙ্গি মেয়ে তার অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ছিলো —মেয়েটা এমন নির্লজ্জ যে, তাকে বিয়ে না-ক'রে ছাড়লোই না। আমরা বন্ধুরা দু-হাতে ঠেকাতে চাইলাম, কিন্তু রমেন শিষ দিতে-দিতে চ'লে গেলো রেজিষ্ট্রারের আপিশে। এক বছরের মধ্যেই বিয়ে গেলো ভেস্তে—কিন্তু তাতেও রমেনের বিকার নেই, আগের মতোই মহা উৎসাহে সে দোকান চালাচ্ছে, এবং অবিলম্বে আর-একটি ফিরিঙ্গি মেয়েকে এনে কাউণ্টারে দাঁড় করিয়েছে।

লেক রোডের ঠিকানায় এসে দেখি, রমেন আমার জন্য ফুটপাতে পায়চারি করছে। গাড়ি থেকে নেমে বললুম, 'যাক, তবু দেখা হ'লো তোমার সঙ্গে। আজকাল তো পাত্তাই নেই তোমার।'

রমেন সলজ্জ হেসে বললো, 'যা ব্যস্ত থাকি। চলো উপরে।'

শৈলেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী গায়ত্রী দেবী দু'জনেই আমাকে সহাস্যে অভ্যর্থনা করলেন। এর আগে শৈলেশবাবুর বই প'ড়ে

খুশি হয়েছিলুম, আলাপ হ'য়ে আরো খুশি হলুম। মনে হ'লো চমৎকার মানুষ—দু-জনেই। অভিবাদন ইত্যাদির পরে বললুম, 'পেশেন্ট কোথায়?'

'আসুন এ-ঘরে,' ব'লে গায়ত্রী দেবী আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন।

সেখানে যে মেয়েটি শুয়ে ছিলো, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, তার সঙ্গেই পরে আমার বিয়ে হ'লো। আমাদের দেখে ত্রস্ত হ'য়ে উঠে বসলো সে। তাকে দেখে আমি অবাক হলুম—সামান্য পায়ের ব্যথায় কোনো মানুষের চেহারা কি এত খারাপ হ'তে পারে? মুখ ফ্যাকাশে, জ্বরের রোগীর মতো শুকনো ঠোঁট, চোখ লাল, মাথার চুল মুখে-চোখে ছড়ানো। এক পলক তাকিয়েই আমার মনে হ'লো অসুখটা বেশ শক্ত-রকম কিছু।

অথচ খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রেও তেমন কিছু পেলুম না। আমি যতক্ষণ নিচু হ'য়ে পা পরীক্ষা করছিলুম, রোগিণী দু-হাঁটুর ফাঁকে থুতনি চেপে চুপ ক'রে ছিলো; সোজা হ'য়ে জিগেস করলুম, 'ব্যথা কি খুব?'

মেয়েটি কোনো জবাব দিলো না।

আবার জিগেস করলুম, 'খুব বেশি ব্যথা?'

আমার পাশ থেকে রমেন বললো, 'বলো, বীণা, কথার জবাব দাও।'

মেয়েটি কারো দিকে না-তাকিয়ে আস্তে বললো, 'হ্যাঁ, খুব।'

মামুলি একটা প্রেস্ক্রিপশন লিখে বাইরে এসে বললুম, 'কিছুই তো হয়নি, অথচ বড্ড যেন কাহিল হ'য়ে পড়েছেন।'

শৈলেশবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, খুবই কাহিল।'

অভয় দেবার সুরে বললুম, 'ভাবনার কিছু নেই—শিগগিরই সেরে যাবে।'

রমেন বললো, 'অল্প থেকেই অনেক সময় বিভ্রাট দাঁড়ায় কিনা, তাই তোমাকে ডাকলুম। নাটকটা না পণ্ড হয়।'

'না, না, সে-ভয় নেই। সেরে যাবে।'

আমি ডাক্তার ব'লেই হোক, বা যে-কোনো কারণেই হোক, শৈলেশবাবু আর গায়ত্রী দেবী দু-জনেই আমাকে একটু সুনজরে দেখেছেন মনে হ'লো। রিহার্সেলে আসবার নিমন্ত্রণ জানালেন। সপ্তাহে তিন দিন ক'রে রিহার্সেল হয় তাঁদের বাড়িতেই। কালই আছে, যদি আমার সময় হয়—

'খুব চেষ্টা করবো,' ব'লে আমি তখনকার মতো বিদায় নিলুম। রমেন আমার সঙ্গে-সঙ্গে নেমে এসে বললো, 'এসো না রিহার্সেলে—ভালোই লাগবে।'

সন্ধেবেলাটা আমি আড্ডা দিয়েই কাটাই। যাদের সঙ্গে দিই তারা সকলেই ডাক্তার। ডাক্তারের ডাক্তার ছাড়া বন্ধু হয় না—বাইরের লোকের সঙ্গে বন্ধুতা করতে চায় না তারা, পাছে বিনি পয়সার রোগীর সংখ্যা বেড়ে যায়। ডাক্তারি গল্প, ডাক্তারি রসিকতা কিছুদিন পরে একঘেয়ে হ'য়ে আসে, আর সেই একঘেয়েমির প্রতিষেধকরূপে ছোকরা ডাক্তাররা যে-সব

উত্তেজনার আয়োজন করে, আগেই বলেছি তাতে আমি কখনো যোগ দিতুম না। রিহার্সেলে যাবার নিমন্ত্রণ তাই উড়িয়ে দিতে পারলুম না। ওখানকার আড্ডা নিশ্চয়ই অন্য রকম— আমার পক্ষে নতুন রকমই হবে। পরের দিন সন্ধ্যাবেলা ধরমতলার গোলমালের মধ্যে ব'সে-ব'সে ভাবছি ওখানে যাবো কিনা, এমন সময় রমেন দ্রুত ঘরে ঢুকে বললে, 'চলো।'

'কোথায়?'

'বাঃ, রিহার্সেলে যাবে না?'

'তুমি যাচ্ছো?'

'আমি তো রোজই যাই।'

'আমি—সত্যি যাবো?'

'সত্যি যাবো মানে? আরে, চলো-চলো, খুব খুশি হবেন ওঁরা।'

ভদ্রজনোচিত ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে রমেনের পাশে তার ক্রীম রঙের মরিস গাড়িতে উঠে বসলুম, খানিক পরেই শৈলেশবাবুর ড্রয়িংরুমে ঢুকলুম। রমেনের উদ্দেশে যে অভ্যর্থনা নানা কণ্ঠের কনসার্টে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠছিলো, আমাকে দেখে তা একটু সংযত হ'লো। অনেকেই আমার দিকে একটু তাকালেন: ভাবখানা—ইনি আবার কে? ইনট্রোডাকশনের ভার নিলেন শৈলেশবাবু; প্রথমে তিনি আমার নাম বললেন, তারপর একে-একে অন্য-সকলের নাম—মেহনৎ বড়ো কম না, কারণ ঘরের মধ্যে অন্তত কুড়িজন লোক ছোটো-ছোটো দলে বিভক্ত হ'য়ে

জটলা করছিলো, তাদের কারো-কারো মনোযোগ আকর্ষণ করাই বেশ শক্ত কাজ।

আমার অনুমান ভুল হয়নি—এ-আড্ডার স্বাদ একেবারেই আলাদা, তখন পর্যন্ত আমার জীবনে এমন-কোনো অভিজ্ঞতা হয়নি এর সঙ্গে যার তুলনা করতে পারি। উজ্জ্বল আলো-জ্বলা ঘরে এতগুলি সুশ্রী সুবেশ তরুণতরুণীর মেলা আমার জীবনে কবে আর দেখেছিলুম! তাদের হাসি, দৃষ্টি, কথাবার্তা, চলাফেরা, একটুখানি হাত নাড়া পর্যন্ত জানিয়ে দিচ্ছে যে, তারা এক উজ্জ্বল জগতের অধিবাসী, মেডিকেল কলেজের সীমানার মধ্যে যার অস্তিত্বও কেউ সন্দেহ করে না। সেদিন আমার তা-ই মনে হয়েছিলো, যদিও পরে মিশতে-মিশতে বুঝেছিলুম যে, এরা অনেকেই আমাদের মতোই সাধারণ, শুধু উপরের পালিশটা একটু বেশি চিকচিকে।

ঘরে ঢোকার মিনিটখানেকের মধ্যেই রমেনের সঙ্গ আমি হারালুম। চারদিক থেকে সবাই তাকে ডাকছে: কখনো এ-দলে, কখনো ও-দলে, কখনো ব'সে, কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো আধো শুয়ে—সে চোখে হাসছে, মুখে হাসছে, চোখেমুখে কথা কইছে। রমেনের স্বভাবটা খুব তরল, তার কোথাও আড় নেই; সে যা-ই করে তা-ই যেন তার চেহারার জন্যই তাকে মানিয়ে যায়। বরাবরই দেখেছি সে যেখানে যায় সেখানেই সকলের প্রিয়পাত্র হয়—এখানেও সে সমস্তটা জুড়ে আছে দেখলুম। তার সঙ্গে দুটো-একটা

গোপনীয় কথা আছে সকলেরই,—স্বয়ং গায়ত্রী দেবী জানলার ধারে দাঁড়িয়ে তার সঙ্গে প্রায় দশ মিনিট ধ'রে নিচুগলায় আলাপ করলেন।

শৈলেশবাবু অনেকক্ষণ ধ'রেই রিহার্সেল আরম্ভের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু এদের গল্পই ফুরোয় না। ইতিমধ্যে চা এলো, চায়ের সঙ্গে কড়াইশুঁটি-ছিটোনো চিঁড়ে-ভাজা। একবারে সকলের হ'লো না, আমি অতিথি ব'লে প্রথম বারেই পেলুম; দ্বিতীয় প্রস্থ হ'তে-হ'তে আটটা বাজলো। তখন শৈলেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এবার আরম্ভ হোক। অনুপম আর ললিতার দৃশ্যটা অনেকদিন হয় না, সেটা আজ প্রথম হবে। অনুপম! ললিতা!'

রমেন উঠে দাঁড়িয়ে মুখ-চোখের চেহারা গম্ভীর ক'রে ফেললো।

'ললিতা! বীণা, চ'লে এসো!'

আমার কালকের রোগিণী—এতক্ষণ দেয়ালে ঠেশ দিয়ে চুপ ক'রে এক কোণে ব'সে ছিলো। আমি লক্ষ্য করেছিলুম, এত লোকের মধ্যে থেকেও একটি কথা সে বলেনি, চোখ তুলেও তাকায়নি কারো দিকে। একখানা বই কোলে নিয়ে বইয়ের দিকে তাকিয়ে ছিলো, অথচ সে যে পড়ছে না তার মুখ দেখেই তা বোঝা যায়। সে-মুখ কালকের মতোই ফ্যাকাশে। সন্ধেবেলায় সে চুল বেঁধেছে, ভালো কাপড় পরেছে, একটু প্রসাধনও করেছে—কিন্তু তার সমস্ত দেহটিতে

যেন এক ফোঁটা রস নেই। আমি এসেই গায়ত্রী দেবীকে তার কথা জিগেস করেছিলুম, তিনি বলেছিলেন আজ একটু ভালো আছে। কিন্তু ভালো থাকার কোনো লক্ষণ তো দেখছি না! একটু উদ্বিগ্নই হলুম মনে-মনে। একবার রক্ত পরীক্ষা ক'রে দেখলে হয়—যে-রকম রোগা দেখছি, এক্সরে করলেও মন্দ হয় না।

শৈলেশবাবু আবার ডাকলেন, 'বীণা!'

ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা পা নিয়ে খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে বীণা এসে দাঁড়ালো। শৈলেশবাবু বললেন, 'রমেন, বলো এবার।'

আমি এতক্ষণ বুঝিইনি যে, রমেনও পার্ট করছে। আর পার্টও যে-সে নয়, তরুণ প্রেমিকের। সমস্ত বইটার মধ্যে অনুপম-ললিতার প্রেমের ব্যাপারটাই সবচেয়ে ভালো লেগেছিলো আমার। ন'ড়ে-চ'ড়ে ভালো হ'য়ে বসলুম।

রমেন বললো, "কী, আমাকে চিনতে পারছো?"

বীণা অস্ফুটস্বরে কী বললো বোঝা গেলো না। 'ভালো ক'রে বলো!' পিছন থেকে গ্রন্থকার তাড়া দিলেন।

এবার মৃদু আওয়াজ শুনলুম,—"বাঃ, আপনি আমাদের অনুপমবাবু না!"

'তাকিয়ে বলো! ওর দিকে তাকাও!'

অতি কষ্টে চোখ তুলে বীণা আবার কথাটি আওড়ালো।

'হাসো, হেসে বলো!'

ক্যাকাশে একটু হাসলো এবার। কিন্তু হাসির সঙ্গে কথার মিল হ'লো না, দুটোই ফাঁকা ঠেকলো।

ততক্ষণে আমি ভাবছি এ-মেয়েকে এ-পার্টে এঁরা নিলেন কেন।

শৈলেশবাবু উঠে দাঁড়িয়ে একটি বক্তৃতা শুরু করলেন। 'বীণা, তুমি কি চাও যে, শুধু তোমার জন্য আমাদের এত পরিশ্রম পণ্ড হয়? তুমি যদি এ-রকম করো তাহ'লে তো অন্য কারো উৎসাহ হবে না—তোমার পার্টটাই যে সবচেয়ে বড়ো, সকলের সঙ্গেই তোমার কথা আছে।'

বীণা নিশ্বাস ফেলে বললো, 'আমাকে বাদ দিন।'

'কী ছেলেমানষি করছো!' ব'লে রমেন তার মাথায় টোকা দিলো। 'ভালো হ'য়ে দাঁড়াও—ভালো ক'রে পার্ট বলো!'

সঙ্গে-সঙ্গে মেয়েটি যেন কেঁপে উঠলো, তার চোখ খুলে গেলো, মুখে রক্ত এলো। তারপর পার্ট সে একরকম মন্দ বললো না। তবু তার মুখ থেকে কষ্টের রেখা যেন কিছুতেই মিলোচ্ছে না; কথাগুলি সে যেন বলতে চায় না, কিছুতেই মুখে আনতে চায় না, বাধ্য হ'য়েই বলতে হচ্ছে।

খানিক পর শৈলেশবাবু বললেন, 'আচ্ছা, এবার প্রথম অঙ্ক হোক। সর্বেশ্বর, বাসন্তী, লিলি, প্রিয়নাথ—'

বলতে-বলতে চার-পাঁচজন উঠে দাঁড়িয়ে মেঝে দখল করলো।

রাত সাড়ে-দশটা পর্যন্ত রিহার্সেল চললো। বন্ধু, কর্মী, উৎসাহদাতা আরো অনেকে এলেন—ঘর ভর্তি। চেয়ারগুলি দেয়ালের সঙ্গে লাগিয়ে-লাগিয়ে মেঝেতে মস্ত ফরাশ বিছোনো হয়েছিলো, তারই এক কোণে ব'সে আমি দেখছি, শুনছি, ভাবছি, অবাক হচ্ছি। আমার আশে-পাশে যাঁরা আছেন, সকলেরই বেশ গুণী-গুণী কিংবা কেজো-কেজো চেহারা। একজন ফাউন্টেন পেন দিয়ে অবিশ্রান্ত কাগজের উপর মেয়েদের স্কেচ ক'রে যাচ্ছেন, কেউ পেনসিল নিয়ে বড়োরকমের হিশেবে মগ্ন, কেউ-বা ছাপাখানার প্রুফ দেখছেন। কখনো তিন-চারজন মিলে বারান্দায় চ'লে গিয়ে খুব সম্ভব মনের কথার আদান-প্রদান করছে; তাদের কলস্বর রিহার্সেলের ব্যাঘাত না-করলেও দরজা-ঘেঁষে-বসা আমার কানে একটু-আধটু পৌঁচচ্ছে। এই বিচিত্র নাচুনির মধ্যে নিজেকে আমার বেখাপ্পা লাগছিলো, তবু ভালো লাগেনি বলতে পারবো না, কারণ, চুপ ক'রে একা ব'সে-ব'সেও অতখানি সময় কেমন ক'রে কেটে গেলো টেরই পেলুম না।

সাড়ে-দশটার সময় কে একজন বললো, 'আজ এখানেই থাক।'

শৈলেশবাবু বললেন, 'অনুপম-ললিতার শেষ দৃশ্যটা একবার—'

বীণা ব'লে উঠলো, 'না, না, ওটা না।' হঠাৎ এমন জোর দিয়ে বললো যে আমি অবাক হলাম।

রমেন বললো, 'নিশ্চয়ই! এসো বীণা, রাত হ'য়ে যাচ্ছে।'

বীণা আস্তে-আস্তে উঠে এলো। দেখে মনে হ'লো তার মুখ দিয়ে একটি কথাও ফুটবে না, কিন্তু এই শেষ দৃশ্যটুকু কী সুন্দরই বললো সে। অনুপম যখন বললো, 'আমি যাই, ললিতা,' তখন 'না, যেয়ো না—আমাকে ফেলে যেয়ো না তুমি,' বলতে-বলতে তার চোখ জলে ভ'রে এলো। আমি মনে-মনে খুব তারিফ করলুম।

রমেন বিদায় নিলো সকলের শেষে, ওর জন্য আমাকেও দেরি করতে হ'লো। গায়ত্রী দেবী বললেন, 'আসবেন মাঝে-মাঝে—কেমন?'

আমি বিনীতভাবে মাথা নোয়ালুম, আর রমেন ফশ ক'রে ব'লে উঠলো, 'মাঝে-মাঝে কেন, রোজই আসবে। ওর তো কোনো প্র্যাকটিস নেই—শুধু লোক দেখাবার জন্য চেম্বর সাজিয়ে ব'সে থাকে।'

গায়ত্রী দেবী হেসে বললেন, 'বেশ তো, এখানেই আপনার প্র্যাকটিস শুরু করুন। আপনি আমাদের নব নীড়ের মেডিকেল অফিসার নিযুক্ত হ'লেন।'

আমি বললুম, 'সে তো ভালো কথাই, কিন্তু আমার প্রথম কেসটায় বিশেষ সুবিধে করতে পেরেছি ব'লে তো মনে হচ্ছে না।'

'বীণা? ওর কিছু হয়নি—ও সেরে যাবে।'

সে-রাত্রিটা রমেন আমার ওখানে কাটালো। আমি

চেম্বরেই বসি, চেম্বরেই শুই—মাঝে, তখনো তা-ই করতুম। রেস্তোঁরা থেকে কিছু ফ্রাইড রাইস আর কটলেট আনিয়ে নিলুম, খাওয়ার পরে কফি নিয়ে ব'সে গল্প। কথায়-কথায় আমি বললুম, 'বীণা মেয়েটি বেশ অভিনয় করে কিন্তু।'

রমেন হাসলো, কিছু বললো না।

'কিন্তু স্বাস্থ্য তেমন ভালো মনে হচ্ছে না।'

'স্বাস্থ্য ভালোই—সম্প্রতি একটু খারাপ হয়েছে।'

'আমার মনে হচ্ছিলো, পায়ের কাটাটা কিছু না—ভিতরে-ভিতরে শক্ত কোনো অসুখ করেছে।'

'ঠিকই ধরেছো।'

আমি উৎসাহিত হ'য়ে বললুম, 'কী অস্বাভাবিক ফ্যাকাশে—অ্যানেমিয়া মনে হয়। বলো তো খুব ভালো ক'রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করি। না-হয় মেজর ঘোষকে একবার—'

'কোনো ডাক্তার কি ওর অসুখ সারাতে পারবে?'

'বলো কী! পারবে না! তুমি নিজে অর্ধেক ডাক্তার—তোমার ও-রকম বলা উচিত না।'

'ওর অসুখটা কী আমি জানি।'

'তুমি জানো?'

'ওর অসুখের নাম, প্রেম।'

'কী বললে?'

'প্রেম। লোকে যাকে প্রেমে-পড়া বলে, তা-ই। ও প্রেমে পড়েছে।'

এ-কথা শুনে আমি যেন ডাঙা থেকে জলে পড়লুম। একটু পরে নিজেকে সামলে মুখে আবার ডাক্তারি ভাব এনে বললুম, 'ও। তাহ'লে আর ডাক্তারের কিছু করবার নেই।'

'অন্য ডাক্তারের না থাকলেও তোমার আছে.' ব'লে রমেন তার লম্বা শরীরটি ঈষৎ বেঁকিয়ে শুয়ে পড়লো। পায়ে পা ঘষতে-ঘষতে বললো, 'আঃ, তোমার এই কাউচটি ভারি আরামের। ব্যাপারটা হয়েছে কী, মেয়েটির এই ব্যাধির যে-উপলক্ষ্য, সে —আমি।'

আমি হাসলুম। 'এ তো তোমার জীবনে কিছু নতুন ঘটনা নয়।'

রমেন হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে বললো, 'তা তুমি আমাকে কী করতে বলো ? আমি কি ম'রে যাবো, না দেশত্যাগী হবো ! বীণা অমন ভালো মেয়ে, ও যে হঠাৎ বিশ্রী একটা কাণ্ড বাধাবে কক্ষনো আমি ভাবিনি।'

এর পর রমেন তার দুঃখের কথা শুরু করলো। এ-রকম হ'তে থাকলে জীবনে আর শান্তি কোথায়। ঐ-তো সারাদিন ব'সে-ব'সে ব্যবসা করে—সন্ধেবেলাটা শৈলেশবাবুর ওখানে কাটে বেশ, ওঁদের সঙ্গে অল্প সময়ের মধ্যেই আত্মীয়তার মতোই হয়েছে তার, দাদা-বৌদি ডাকে, ওঁরাও লোক ভারি ভালো, নয়তো ওঁদের কাছে এখন তার মুখ দেখানোই দায় হ'তো।

এটুকু শুনে আমি বললুম, 'তা, তোমার একলার আর দোষ কী—এ-সব তো একপক্ষে হয় না।'

'বিশ্বাস করবে কিনা জানিনা, কিন্তু এটা একেবারেই এক পক্ষের। আমার দিক থেকে কিছুই নেই।'

'কিছুই নেই? বাজে কথা!'

'ঐ তো! তুমিও এ-কথা বললে তো! শৈলেশবাবু গায়ত্রী দেবীও মনে-মনে কি আর তা-ই না ভাবেন! এদিকে আমি এই ক-দিন ধ'রে ওকে বোঝাবার চেষ্টা ক'রে-ক'রে হয়রান হ'য়ে গেলুম! আর পারি না।'

'কী বলছো তুমি ওকে?'

'বলছি শান্ত হ'তে, স্থির হ'তে, ভালো হ'তে, লক্ষ্মী হ'তে।'

'আর সে?'

'বলবে আবার কী—কান্না, কেবল কান্না! কোনো মানুষ যে এত কাঁদতে পারে জানতুম না। ফুটফুটে মেয়েটা মড়ার মতো হ'য়ে গেলো। আর ও-রকম ক'রে কাউকে কাঁদতে দেখলে কেমন লাগে বলো তো—আর তুমি যখন জানো সে-কান্না তোমারই জন্য! আমি যত সান্ত্বনা দিতে যাই, ততই ও আকুল হ'য়ে কাঁদে।'

খারো যে-সব বললো তার মোদ্দা কথা এই যে, ও-বাড়ির সংশ্রব সে ছাড়তো, কিন্তু নাটকটার জন্য তারও উপায় নেই। আর তাছাড়া ছাড়বেই-বা কেন? তার নিজের কি কোনো জীবন নেই, সুখ নেই, শান্তি নেই? যেখানে তার ভালো লাগে

সেখানে সে কি যেতেও পারবে না, যেহেতু একজন যুবতী মেয়ের মাথা খারাপ হয়েছে? কী অন্যায় ভাবো তো!

আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম যে, এটা তার ভালো চেহারার খাজনা।

হ্যাঁ—তার চেহারাই তার শত্রু তা সে অনেক আগেই বুঝেছিলো। ছাখো না কাণ্ড, রিহার্সেলের হৈ-চৈতে বেশ কাটছিলো সন্ধ্যাগুলো, হঠাৎ চোখের জলে সব ডুবতে বসলো। বীণাকে আমি যা দেখেছি—রমেন বললো—তা থেকে ধারণাই করা যাবে না ও কেমন মেয়ে। টগবগে চটপটে হাসিখুশি—"নব নীড়" নভেলে ললিতার চরিত্র প্রথম দিকে যে-রকম আছে ঠিক তা-ই। শৈলেশবাবু ওটুকু বোধহয় শ্যালিকার ছাঁচেই এঁকেছিলেন। ও দরজা দিয়ে ঢুকলে মন-খারাপের ভূত জানলা দিয়ে পালায়। বেশ মেয়ে, খুবই ভালো, এবং তাকে যদি কেউ জিগেস করে সে নিশ্চয়ই বলবে যে, শৈলেশবাবুর এই শ্যালিকাটিকে যে বিয়ে করবে সে রীতিমতো ভাগ্যবান।

'ভাগ্যবানটিকে সে নিজেই তো বেছে নিয়েছে।'

আমার এই ঠাট্টার উত্তরে রমেন দীর্ঘশ্বাস ফেললো। কেনই-বা সে জুটেছিলো ঐ দলে! শৈলেশবাবুদের নাটকের সব ঠিক হ'য়ে গিয়েছিলো, শুধু অনুপমের পার্টের জন্যই লোক পাচ্ছিলেন না ওঁরা—রমেন দৈবাৎ জুটে যেতেই পুরো দমে রিহার্সেল শুরু হ'লো। মাসখানেক চমৎকার চললো রিহার্সেল। সবাই

একবাক্যে বললো যে, ললিতা যা হচ্ছে তার উপর কথা নেই। ছুটোছুটি লাফালাফির প্রথম অংশটা তো ওর ভালো হবেই—কিন্তু শেষের দিকে প্রেমের দৃশ্য, দুঃখের দৃশ্যগুলিও যে ও অত সুন্দর করতে পারবে, তা ওর দিদিও আশা করেনি। রিহার্সেল সুন্দর এগোচ্ছে, এর মধ্যে হঠাৎ একদিন শোনা গেলো যে বীণার শরীর খুব খারাপ, আজ রিহার্সেল দিতে পারবে না। রমেন ব্যস্ত হ'লো, সবাই ব্যস্ত হ'লো, কিন্তু ওর সঙ্গে কাউকেই দেখা করতে দিলেন না ওঁরা—ভীষণ নাকি মাথা ধরেছে, চুপচাপ শুয়ে আছে অন্ধকার ঘরে। সেদিন রিহার্সেল মোটে জমলোই না, শৈলেশবাবুও অন্যমনস্ক, গায়ত্রী দেবী বার-বার উঠে ভিতরে যাচ্ছেন, অন্য দিনের চাইতে একটু সকাল-সকালই আড্ডা ভাঙলো। তখন গায়ত্রী দেবী এক ফাঁকে রমেনকে ডেকে বললেন যে, তার সঙ্গে দরকারি কথা আছে।

তাঁর মুখে খবর শুনে রমেন বজ্রাহত। আগের দিন রিহার্সেল ছিলো না, না-থাকলেও সে মাঝে-মাঝে যায়, কিন্তু সেদিন যায়নি। বীণার চোখ-মুখ বিকেল থেকেই থমথমে, এ-ঘর থেকে ও-ঘরে যাচ্ছে, এ-জানলা থেকে ও-জানলায় দাঁড়াচ্ছে। গায়ত্রী দেবী দু-একবার জিগেস করলেন; 'কী রে, তোকে অমন দেখাচ্ছে কেন?' কোনো জবাব নেই। সন্ধের পর হঠাৎ জিগেস করলো, 'রমেনবাবু আজ আসবেন না, দিদি?' 'কী জানি—আটটা বেজে গেলো, আজ কি আর

আসবে ঃ 'ওঁকে আসতে বলো—টেলিফোন করো।' গায়ত্রী দেবী অবাক হ'য়ে বোনের মুখের দিকে তাকিয়েই দেখলেন তার চোখ জলে ভরা। 'বীণা! হয়েছে কী তোর?' ব'লে তার কাঁধের উপর হাত রাখতেই বীণা দুই হাতে দিদিকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে-কাঁদতে বললো, 'দিদি, আমি রমেনকে বিয়ে করবো, আমি রমেনকে বিয়ে করবো!' তার পর থেকে এ-পর্যন্ত এই চলেছে। নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে শয্যা নিয়েছে বীণা। 'কী মুশকিলেই পড়েছি।' ব'লে গায়ত্রী দেবী কথা শেষ করলেন।

এর উত্তরে রমেন কী বলবে, কোনদিকে তাকাবে, হাত দুটো কোথায় রাখবে, কিছুই ভেবে পেলো না। বিশ্রী লাগলো নিজেকে, অথচ—অপরাধী সত্যি তো—তার কী দোষ? সে কখনো কিছু করেনি, বলেনি, ভাবেওনি, যাতে বীণার মনে ও-সব ভাব জাগতে পারে। এ যে বিশ্বাস করাই শক্ত।

কিন্তু বীণাকে চোখে দেখে বিশ্বাস করতেই হ'লো। করুণ অবস্থা তার। রমেন কাছে ব'সে জিগেস করলো, 'কী হয়েছে, বীণা?' আর অমনি তার হাতটা আঁকড়ে ধ'রে কেঁদে ফেললো সে। সাধারণ শোভনতার জ্ঞানটুকুও নেই—পাগল হ'লো নাকি! রমেন স্তম্ভিত হ'লো, কিন্তু সেই সঙ্গে খুব কষ্টও হ'লো তার।

দত্ত-দম্পতীর সৌজন্যবোধ অসাধারণ, তাঁরা ঘর ছেড়ে চ'লে গেলেন। রমেনের ভারি বাধো-বাধো লাগলো, সেটা কাটাবার জন্য হাসির চেষ্টা ক'রে বললো, 'কী, ব্যাপার কী?'

ভাঙা-গলায় জবাব হ'লো, 'দিদির কাছে সব শুনেছেন ?'

'শুনলুম।'

'আপনি কী বলেন ?'

রমেন তাকে বোঝালো যে, এ-বিষয়ে কথা বলবার পরে অনেক সময় হবে, আপাতত তার সুস্থ হ'য়ে ওঠা চাই, যাতে নাটকটি নষ্ট না হয়।

কিন্তু কিছুই ফল হ'লো না। তাকে বোঝাতে, শান্ত করতে, সুস্থ করতে এ-ক'দিন ধ'রে কম চেষ্টা রমেন করেনি, আর তার দিদি তো লেগেই [illegible] সব সময়—কিন্তু না। বীণার কী-এক ধারণা হয়েছে যে, রমেনকে বিয়ে না করলে জীবনই তার ব্যর্থ হবে, এ-থেকে কেউ তাকে একচুল নড়াতে পারেনি। রমেন যে আগে একবার বিয়ে করেছিলো, তাতে ওর কিছুই এসে যায় না, আর তার জীবনযাপন যে একটু ফিরিঙ্গি-ভাবের সেটা ওর পছন্দই। ঐরকম পুরুষই নাকি ওর আদর্শ—লম্বা, ফর্শা, শিষ দিতে-দিতে সিঁড়ি ওঠে নামে, টেনিস খেলে, সব সময় প্যাণ্ট প'রে থাকে। দিদিকে নাকি এমন কথাও বলেছে যে, সাধারণভাবে যদি বিয়ে না হয়, তাহ'লে সে নিজেই একদিন রমেনের বাড়ি গিয়ে উঠবে—তখন তো আর গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দিতে পারবে না।

রাত দুটো পর্যন্ত রমেন আমাকে তার দুঃখের কথা শোনালো। তারপর জিগেস করলো, 'তুমি বলো তো এখন কী করা যায় ?'

আমি অবশ্য জবাব দিলুম, এর উপায় খুব সহজ—বিয়ে।

'আমাকে বিয়ে করতে বলছো? সেটা সম্ভব হ'লে তো ভাবনাই ছিলো না।'

'সম্ভব নয় কেন?'

রমেন বললো, 'বিয়ে-টিয়ে আমার ভালোই লাগে না।'

এবার আমি ব্যস্ত হলুম রমেনকে বোঝাতে। ভালো লাগে না? তার মানে? কিন্তু করবে তো? না-ক'রে তো আর সারাজীবন থাকবে না? আর, বিয়ের কোনো বাধাও নেই, তুমিই তো বললে যে, মেয়েটিকে তোমার ভালো লাগে, তার জন্য কষ্টও বোধ করো—

'কষ্ট কেন বোধ করবো না—আমি একটা মানুষ তো!'

'কিন্তু তোমার বিয়ে করায় বাধাটা কী তা তো আমি বুঝতে পারছি না।'

'আছে বাধা।' রমেন এতক্ষণে আর-এক কথা ফাঁশ করলো—'রুথকে আমি কথা দিয়েছি যে, আবার যদি কখনো বিয়ে করি, ওকেই করবো।'

'রুথ! সে আবার কে?'

'রুথ আমার দোকানের—'

'রমেন, ফের!'

'আঃ—বোঝো না—কেউ নেই মেয়েটার—আর কেমন এক-রকম ধ'রে পড়েছে—খুব সম্ভব বিয়ে আমি আর করবো না, কিন্তু যদি কখনো—'

আমি রেগে উঠে বললুম, 'তাহ'লে বাঙালি মেয়ের চোখের জলের চাইতে একটা ফিরিঙ্গির ছলাকলাই তোমার কাছে বেশি হ'লো ?'

'বকো যত খুশি ! আমি ঘুমুই ।'

রমেন হ্যাঁচকা টানে কোট খুলে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেললো, ট্রাউজর্সের পা দুটো হাঁটু অবধি মুড়ে গায়ে কম্বল টেনে ঐ কাউচেই লম্বা হ'লো।

আমি রাগ ক'রে আর কথা বললুম না।

সে-রাত্রে খানিকক্ষণ ঘুম এলো না আমার। বীণার মলিন মুখ মনে পড়লো, ফোলা-ফোলা চোখ, উশকো চুল। কেমন কষ্ট লাগলো, অথচ সেটা ঠিক কষ্টও না, একটা নতুন রকমের ভালো লাগা। আমি কল্পনা করলুম—বীণাকে আমি শান্ত করছি, সান্ত্বনা দিচ্ছি ; আমার কথা সে শুনতেই চাচ্ছে না, কিন্তু আমি ব'লে যাচ্ছি—একবার সে একটু হাসলো, একটি কথা বললো, আর তারপর আমি হঠাৎ দেখলুম যে, আমার কল্পনার মধ্যে রমেন আর নেই, তার কথা ভুলেই গিয়েছি। নিজের কাছেই লজ্জিত হ'য়ে তখনই মনে-মনে স্থির করলুম যে, পরের ব্যাপারে মাথা ঘামানোটা কিছু না, শৈলেশবাবুর বাড়িতে আমার আর যাবারই মানে হয় না কোনো, নিজের চরকায় তেল দেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু রমেন আমাকে ছাড়লো না, পরের দিনও ধ'রে নিয়ে গেলো। আগেই বলেছি যে ওখানকার আবহাওয়া আমার

ভালো লেগেছিলো ; দু-চারদিন যেতে-যেতে নিজেরই নেশা লাগলো, তারপর রমেনের পুনশ্চ হওয়া ছেড়ে দিয়ে আমি স্বাধীনভাবেই যাওয়া ধরলুম। এ-ক'দিনে বীণা অনেকটা সামলে উঠেছে, মুখের রং বদলেছে, হাসি ফুটেছে, পার্ট ছাড়াও আরো অনেক কথা বলে। তার আরোগ্যের সঙ্গে-সঙ্গে রিহার্সেলের বেগও খুব বেড়ে গেছে, আর রিহার্সেলের আগে, পরে এবং ফাঁকে-ফাঁকে বিশুদ্ধ আড্ডা যা চলছে, ও-রকম আমি জীবনে সেই একবারই দেখেছিলুম।

শৈলেশবাবুদের বাড়িতে আমি প্রথম গিয়েছিলুম শীতকালে —বোধহয় জানুয়ারি তখন। মার্চের প্রথম সপ্তাহে 'নব নীড়' স্টেজে উঠলো—অভিনয় হ'লো চার রাত্রি। চার রাত্রির অভিনয়েই আমি উপস্থিত, কখনো অডিটরিয়মে দর্শকদের রিঅ্যাকশন লক্ষ্য করছি, কখনো ভিতরে গিয়ে অভিনেতাদের আগামী দৃশ্যের কস্ট্যুম সাজিয়ে রাখছি। গাড়ি নিয়ে নানা কাজে ছুটোছুটিও করলুম, আর অভিনয়ের শেষে মস্ত দলের যে-কোনো তিনজনকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেবার সসম্মান দায়িত্ব থেকেও বঞ্চিত হলুম না।

অভিনয় শেষ হ'লো, এখন তার জের চললো আরো এক মাস। প্রথমে শৈলেশবাবুর বাড়িতে, তারপর রেস্তরাঁয়, তারপর তাঁদের এক বন্ধুর বাগানে, পরিশেষে আবার শৈলেশ-বাবুরই বাড়িতে—ভোজের পর ভোজ, উৎসবের পর উৎসব। আমি যদিও বেশি কিছু কাজে লাগিনি, বেশির ভাগ সময়

চুপচাপ ব'সে-ব'সেই কাটিয়েছি, তবু প্রতি উৎসবেই নিমন্ত্রিত হলুম—দত্ত-দম্পতীর ভদ্রতায় ত্রুটি নেই। এ-দু'মাসে দলের অনেকের সঙ্গেই চেনাশোনার সুযোগ হয়েছিলো, এখন আর দলের মধ্যে নিজেকে খাপছাড়া লাগে না; যদিও আমি ডাক্তার মাত্র, এবং সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে অজ্ঞ, তবু এই অত্যুজ্জ্বল দলের কেউ-কেউ ততদিনে আমাকে বেশ সাদরেই গ্রহণ করেছেন। এতগুলি লোকের মধ্যে আমার সঙ্গে বীণারই সবচেয়ে কম চেনা, ফর্ম্যালিটির আঁটো ফ্রেমে যেটুকু ধরে তার বেশি কিছুই না। আমার সম্বন্ধে কেমন একটা বিরুদ্ধ ভাবই লক্ষ্য করেছি তার। হয়তো আমার চেহারাই পছন্দ হয় না—কিংবা এও হ'তে পারে, রমেন যে আমাকে সব কথাই বলেছে তা সে জানে—যে কারণেই হোক, আমার সংসর্গ সে যেন এড়িয়েই চলে। তাতে আমার আপশোষ ছিলো না, ওরকম একজন প্রেমে-পড়া, প্রেমে-পোড়া তরুণীর সঙ্গে কী বলতে হয়, কী-ভাবে চলতে হয়, আমার পক্ষে তা আন্দাজ করাই শক্ত। এ-ই ভালো।

এপ্রিল মাসে দত্ত-দম্পতী কালিম্পং গেলেন। তাঁদের যাবার তারিখে একবার গিয়েছিলুম, আর কেউ ছিলো না তখন। এ-কথা ও-কথার পর গায়ত্রী দেবী বললেন, 'আপনাকে একটা খবর দিই, আপনার রোগিণী এখন সম্পূর্ণ রোগমুক্ত।'

খুব সুখের কথা—মনে-মনে বললুম—কিন্তু আমাকে কেন এ-সব বলা। আমার সঙ্গে সম্পর্ক তো চুকলো।

যেন আমার মনের কথা আঁচ ক'রে গায়ত্রী দেবী আবার বললেন, 'আপনি সবই জানেন—তাই বলছি।'

একটু পরে আমি বললুম, 'আমার কিন্তু মনে হয়, রমেন বিয়ে না-ক'রে খুব অন্যায় করলো।'

'আর-একজনকে কথা দিয়েছে—এর উপর তো কথা নেই।'

'কথা দিয়েছে? ও-সব বাজে কথা। আসলে ওর ইচ্ছে নেই।'

'তা, ইচ্ছার উপরেও তো জোর চলে না। আমি তো বীণাকে এই ব'লেই বুঝিয়েছি—"ওকে তো কখনো পাবি না তুই, তবু কেন এ-রকম করিস? তোর একটা আত্মসম্মান নেই? চিরকাল পুরুষই এসে মেয়ের পায়ে মাথা খুঁড়ে মরেছে আর তুই মেয়ে হ'য়ে—"

এখানে শৈলেশবাবু টিপ্পনি কাটলেন, 'এ-যুগে ও-সব উল্টিয়ে গেছে, আজকাল দেখি, মেয়েরাই তাড়া করে আর পুরুষই ছুটে পালায়। বেচারা রমেন! ওর অবস্থাটা সে-সময় ঈর্ষাযোগ্য ছিলো না।'

গায়ত্রী দেবী বললেন, 'তা, রমেনই যা-হোক ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়েছিলো—আমি ওকে খুবই ভালো বলবো! মেয়েটা যে-রকম দিশেহারা হ'য়ে পড়েছিলো, রমেন একটুও মন্দ হ'লে ওর কি আর রক্ষে ছিলো!'

আরো একটু রমেনের সুখ্যাতি ক'রে গায়ত্রী দেবী বললেন, 'এখন বীণা বলছে, বেশ, রমেন তাকে বিয়ে না-ই

করলো, কিন্তু সেও অন্য কাউকে বিয়ে করবে না, জীবনেও না। আমরা কিন্তু শিগগিরই ওর বিয়ের কথা ভাবছি। এখন ওকে বড়দির কাছে রেখে যাচ্ছি—সেই যিনি নাটকের সময় মেয়েদের কাপড়ের চার্জে ছিলেন, আপনার সঙ্গে তো আলাপ হয়েছে—মা আসবেন সামনের মাসে, এই শেষ মেয়ের বিয়ে হ'লেই তিনি নিশ্চিন্ত। আপনি দেখবেন-না আপনার জানাশোনা কোনো সুপাত্র থাকে যদি।'

আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিলুম, কিন্তু গায়ত্রী দেবীর কথাগুলি আমার বড়ো হৃদয়হীন লাগলো। এই এতো বড়ো একটা কাণ্ড হ'য়ে গেলো—এক্ষুনি আবার বিয়ের কথা! মুখে যা বলেছে তা সম্পূর্ণ সত্য হয়তো নয়, সারা জীবন বিয়ে না-ক'রে নিশ্চয়ই থাকবে না, তাই ব'লে রমেনকে ভোলা কি ওর পক্ষে সহজ! সবাই তো আর রমেনের মতো ফুঁ দিয়ে সব ঝেড়ে ফেলতে পারে না!

গায়ত্রী দেবী আবার বললেন, 'বড়দি থাকেন সাদার্ন এভিনিউতে—মাঝে-মাঝে যাবেন-না ওঁদের ওখানে। ওঁরা খুশি হবেন। আর বীণার শরীরটাও—আমার ইচ্ছে ছিলো ও কোনো ডাক্তারের কথামতো কিছুদিন খুব নিয়মের মধ্যে থাকে—'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়ই। আমি যথাসাধ্য করবো।'

এরপর থেকে আমার যাতায়াত শুরু হ'লো সাদার্ন এভিনিউতে। নব নীড়ের দলের আরো দু-একজন যায়

সেখানে, কিন্তু বেশির ভাগই যায় না—শৈলেশবাবুর বাড়িটাই ছিলো পীঠস্থান, তাঁরা চ'লে যাবার সঙ্গে-সঙ্গে আড্ডাটি ভেঙে গেলো। অন্যদের সঙ্গে যদি-বা ক্বচিৎ দেখা হয়, রমেনের সঙ্গে একেবারেই না—সে যেন এই সুযোগেরই অপেক্ষায় ছিলো, শৈলেশবাবুরা চ'লে যেতেই এমন ডুব দিলো যে তার আর পাত্তাই নেই।

বীণাকে এক কোর্স ক্যালশিয়ম ইনজেকসন দিলুম, খাওয়ার পরে আর শোবার আগে দুটো পেটেন্ট ওষুধ দিলুম, বেঁধে দিলুম ডায়েট। মনে হ'লো চিকিৎসায় ধরেছে —ওর গাল আরো লাল, চোখ আরো একটু উজ্জ্বল, চামড়া আরো চিক্কণ। বড়দি ঠাট্টা ক'রে বললেন, 'বীণার চেহারায় শ্রী খুলেছে—এইবার বিয়ে হবে!'

তার মা এলেন কাশী থেকে, বিয়ের চেষ্টা চলতে লাগলো। যে-কোনো পাত্রের কথা ওর সামনে বলা হয় ও তক্ষুনি দু'হাত তুলে মুখ-ভঙ্গি ক'রে বলে, 'বাবা, বাবা, রক্ষে করো!' এতদিনে ওর আর আমার মধ্যে আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গিয়েছিলো—আমার সামনেই চাদর-জড়ানো ছোকরা প্রোফেসর থেকে রংপুরের বিপত্নীক জমিদার পর্যন্ত সকলকেই নকল ক'রে অভিনয়ের ধরনে এমন মন্তব্য করতে লাগলো যে, দেখতে-দেখতে আমার হাসিও পেলো, আর সেই-সব অচেনা ভদ্রলোকদের কথা ভেবে খারাপও লাগলো মনে-মনে।

বড়দি বললেন, 'বীণা, তোর এ-সব রঙ্গভঙ্গ রাখ। কাউকেই তোর পছন্দ হয় না—এ-রকম করলে বর জুটবে না তোর!'

বীণা বললো, 'আমি কি তার জন্য কাঁদছি?'

বড়দি বললেন, 'কাঁদবার এখনই হয়েছে কী। চারিদিকে যা সব দেখছি আজকাল—পঁচিশ-তিরিশ বয়স হ'য়ে যায় মেয়েগুলোর, তবু বিয়ে হয় না, মাস্টারি করতে-করতে হাড়ে ঘুণ ধরে। তোর না সে-দশা হয়।'

'যার কপালে যা আছে তা কি ঠেকাতে পারে কেউ?'

'কেন এ-রকম পাগলামি করছিস বল তো। মা-র কথা ভাব—তাঁর বয়স হয়েছে, আর ক'দিনই-বা—'

'এ-সব কথা অনেক শুনেছি বড়দি।'

'আচ্ছা, তুই-ই বল, কী-রকম তোর পছন্দ—আমরা সেরকমই চেষ্টা করি।'

বীণা বললো, 'এ কি একটা জামা না জুতো যে, দোকানে ফরমাশ দিলেই পাওয়া যায়?'

আমার সামনেই এ-সব কথা হচ্ছিলো, শুনতে-শুনতে অস্বস্তি লাগছিলো আমার। কোনো ছুতোয় উঠে যাবো কিনা ভাবছি, ঠিক তক্ষুনি বড়দি হঠাৎ আমারই দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পাত্রের জন্য এত খোঁজাখুঁজিরই-বা দরকার কী—এই আমাদের অবনীর সঙ্গেই তো দিব্যি তোকে মানায়।'

এ-কথা শুনে বীণা খিলখিল ক'রে হেসে উঠে বললো, 'ওমা! সে আবার কী কথা!'

ওর হাসিটা স্বাস্থ্যের বেশ ভালো অবস্থারই পরিচয় দিলো, কিন্তু ডাক্তারের কানে সেটা খুব উপাদেয় ঠেকলো না। উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর মুখে বললুম, 'আমি আজ চলি।'

বড়দি বললেন, 'তোমার যেন রাগ ভাব?'

'কী আশ্চর্য!—আমার একটু কাজ আছে, তাই—'

'তোমার গাড়িতে আমাদের একটু হাওয়া খাইয়ে আনবে? যা গরম!'

'বেশ তো, চলুন—'

'তুই যাবি নাকি, বীণা?' বলতে-বলতে বড়দি উঠলেন।

বীণাও এলো। লেকে দু-এক চক্কর দিয়ে গাড়িটা দাঁড় করালুম, বড়দির ইচ্ছা গাড়ি থেকে নেমে ঘাসে বসা হবে। কিন্তু নেমেই তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো এক প্রতিবেশিনীর, দু-জনে কথা বলতে-বলতে খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

আমি বীণাকে বললুম, 'কী করবেন? বসবেন, না ওঁদের পিছন-পিছন যাবেন?'

বীণা বললো, 'ফিরে গেলেই হয়—লেকটা আজকাল বিশ্রী হয়েছে।'

'ওঁরা এলেই বাড়ি ফিরবো—ততক্ষণ আসুন একটু বসি।'

দু-জনে বসলুম, কিন্তু তারপর আর কথা নেই। আমার অল্প-স্বল্প যা মগজ আছে, তারই কোন এক ভাঁজের তলা থেকে

বলবার মতো কিছু কথা খুঁজছি, এমন সময় বীণা হঠাৎ বললো, 'দিদিরা ভাবছেন রমেনকে আমি ভুলে গিয়েছি।—কিন্তু আমি ভুলিনি—ভুলবোও না।'

এ-কথার উত্তরে আমি বললুম, 'আমি তা জানি। ওঁদের কথায় আমারও খুব খারাপ লাগে।'

'কিন্তু আপনাকে একটা কথা জিগেস করি। আপনি কেন এ-বাড়িতে ঘুরঘুর করছেন—আপনি না রমেনের বন্ধু!'

সে-মুহূর্তে আমার মুখের চেহারা কেমন হয়েছিলো আমি অবশ্য তা বলতে পারবো না, তবে খুবই খারাপ হয়েছিলো নিশ্চয়ই, কারণ, আমার দিকে তাকিয়ে বীণারই মুখের ভাব বদলে গেলো। একটু নিচু-গলায় তাড়াতাড়ি বললো, 'কিছু মনে করবেন না—কথাটা খুবই অন্যায় বলেছি।'

'ঠিক বলেছেন,' ব'লে আমি উঠে দাঁড়ালুম।

বীণাও সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে বললো, 'কখনো কাউকে আমি এ-রকম বলি না—আজ আপনাকে বললুম কেন, জানি না। বলুন আপনি এটা মনে রাখবেন না।'

'আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'না, আমি ভুল বলেছি। খুব অন্যায় বলেছি। কাল আপনি আসবেন তো? আসবেন—বলুন আসবেন?'

'আসবো।'

'একটা কথা বলতে পারেন আপনি—রমেন কি তার রুথকে বিয়ে করেছে?'

'জানি না।'

'আপনার সঙ্গে আর দেখা হয় না তার ?'

'অনেকদিন হয় না।'

বীণা আর কথা বললো না।

আমি বললুম, 'আপনার কিছু বলবার থাকে তো তাকে আমি জানাতে পারি।'

'না, কিছু বলবার নেই,' ব'লে বীণা নিশ্বাস ফেললো।

বড়দি এলেন। বীণা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, 'চলো বাড়ি যাই।'

'এখনই ?' ব'লেই বড়দি একবার ওর দিকে, একবার আমার দিকে তাকালেন। 'ব্যাপার কী, ঝগড়া করেছো নাকি দু'জনে ?'

বীণা এমনভাবে হেসে উঠলো যাতে বড়দির কথাটার চরম অসারতা প্রমাণ করা হয়, কিন্তু হাসিটা তেমন খুললো না। আমিও গম্ভীর হ'য়ে থাকলুম।

সেই রাত্রে আমি মনস্থির করলুম। আর না—এখানেই ইতি। বীণা যখন আমাকে অমন কথা মুখের উপরেই বলতে পারলো, মনে-মনে আরো যে কত কী ভাবে, তা কল্পনা ক'রে আমি ঘেমে উঠলুম। 'ঘুরঘুর' কথাটা মাথার মধ্যে পোকার মতো কুঁড়ে খেতে লাগলো। কিন্তু হঠাৎ একটা-কিছু ক'রে ফেলাও ঠিক না—সেটা কেমন নাটুকে দেখাবে, লোকের চোখে পড়বে, আলোচনার বিষয় হবে। হাজার হোক,

এ-ক'মাসে ওঁদের সঙ্গে আমার একটু ঘনিষ্ঠতার মতোই তো হয়েছে। মনের ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না-ক'রে যাওয়া-আসাটা আস্তে-আস্তে কমিয়ে আনবো, তারপর একদিন একেবারেই হাওয়া হ'য়ে যাবো—কারো মনেই হবে না যে উল্লেখযোগ্য কিছু হ'লো—আমিও শান্তি পাবো, ওঁরাও বাঁচবেন, একটা বোকা মানুষের অবাঞ্ছিত সঙ্গ বীণাকেও আর ভোগ করতে হবে না।

মনে-মনে এইরকম সংকল্প ক'রে পরের দিন গিয়ে দেখি, বীণা সেজে-গুজে বাইরের ঘরে ব'সে আছে। আমাকে দেখেই বললো, 'এই তো আপনি এসেছেন!'

আমি ওর দিকে এক ঝলক তাকাতেই আবার বললো, 'আমার এমন ভয় হচ্ছিলো যে, আপনি বুঝি আজ আসবেন না।'

বুঝলুম, কালকের আঘাতের উপর মিষ্টি কথার পুলটিশ লাগানো হচ্ছে। মুখে একটু হাসি টেনে বললুম, 'আসবো না কেন?'

বীণা খুব সরলভাবে ব'লে উঠলো, 'আমিও তো তা-ই বলি! কিন্তু কাল বড়দি আমাকে কী বকাটাই বকলেন!'

'বকলেন! কেন?'

'আমি নাকি ভীষণ অভদ্র, অভব্য, অসভ্য—'

'কী? হয়েছে কী?'

'আমি তো বলছিই যে ও-কথা বলা আমার অন্যায়

হয়েছিলো—তারপরেও আবার এত কথা কেন ? যাক, আপনি এলেন, আমি এবার নিশ্চিন্ত। বড়দি, ও বড়দি,' বীণা ওখানে ব'সে-ব'সেই ডাকলো, 'এসো এখানে, অবনীবাবু এসেছেন !'

বীণার এ-রকম ফুর্তি আমি শিগগির দেখিনি, কখনোই দেখিনি বলা যায়—কেননা আমি ওকে প্রথম যখন দেখলুম তখন থেকেই ও প্রেমের প্রভাবে মুহ্যমান। ওকে ভারি নতুন লাগলো, ছেলেমানুষ লাগলো, ভালো লাগলো।

সান্ধ্য-স্নানের পরে একখানা চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি প'রে বড়দি ঘরে এসে বললেন, 'বীণা, যা তো, চা-টা নিয়ে আয়। নিমকি ভাজা হচ্ছে, তা-ও কয়েকখানা আনিস।'

বীণা চ'লে যেতে বড়দি হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ঐ মুন্সেফ ছেলেটির সঙ্গেই বীণার বিয়ে ঠিক করলুম, অবনী। পাত্রপক্ষের তাড়া আছে, এদিকে মা-ও ভারি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। আর সত্যিই তো, কতই-বা আর দেরি করা যায় !'

শুনে আমার মনে হ'লো বীণা যেন এঁদের ভার হয়েছে, তাকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচেন এঁরা। ভালো লাগলো না কথাটা।

'এই জষ্টিমাসেই উনতিরিশে একটা তারিখ আছে, আমরা ভাবছি, সেদিনই—'

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো, 'এত শিগগির ?'

'গায়ত্রীকে চিঠি লিখে দেয়া হয়েছে—ওরা এসে পড়বে শিগগিরই।'

ব্যাপার এত দূর! অথচ আমি কিছুই জানি না! অবশ্য আমার জানবার কথাই-বা কী হয়েছে—আমি এঁদের কে-বা। আর সেইজন্যই কি বীণার এত ফুর্তি আজ?

বড়দি বললেন, 'তুমি যে কিছু বলছো না?'

'আমি আর কী বলবো—শুধু ভাবছিলুম—'

'কী ভাবছিলে সেটাই তো জানতে চাই।'

'ওর নিজের মত হয়েছে?'

'বীণার? ওর মতের জন্য ব'সে থাকতে হ'লেই হয়েছে। ওর সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও তো ছেলেমানুষ হ'তে পারি না।'

তার মানে, মত নেই? মতের বিরুদ্ধেই বিয়ে। তবু এত ফুর্তি?

চা এলো, নিমকি এলো, বীণাও এলো। কিন্তু চা আমার মুখে তেতো লাগলো, নিমকি বিস্বাদ, বীণার দিকে তাকালুমও না।

চায়ের পর বড়দি বললেন, 'আজও যাবে—লেকে?'

অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়েছিলুম, হঠাৎ চমকে বললুম, 'আমাকে বলছেন?'

'হ্যাঁ, তোমাকেই বলছি। তোমার গাড়ি না-হয় থাক—বেশি দূর তো না—হাঁটতে বেশ লাগবে।'

পাড়ার সকলের সঙ্গেই বড়দির জানাশোনা, রাস্তায়

বেরিয়েই তাঁর সমবয়সী সঙ্গিনী জুটলো, একটু পরেই দেখলুম, বীণা আর আমি ওঁদের ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেছি। তখনকার দিনে বালিগঞ্জে মেয়েদের অবাধ চলাফেরা সবে আরম্ভ হয়েছে। সেইটি লক্ষ্য ক'রে বললুম, 'মেয়েদের এই স্বাধীনতাটা খুব ভালো জিনিশ হয়েছে।'

বীণা বললো, 'হেঁটে-চ'লে বেড়াবার স্বাধীনতাই বুঝি সব ?'

'আস্তে-আস্তে সব বিষয়েই হবে।'

'কোথায় আর ?'

অনেকক্ষণ ধ'রেই কথাটা জিভের ডগায় নিশপিশ করছিলো—এই সুযোগে ব'লে ফেললুমঃ 'বড়দির মুখে একটা সুখবর শুনলুম।'

'কী সুখবর ?'

'এই জষ্টিমাসের উনতিরিশেই নাকি—'

'পাগল হয়েছেন ?'

'কথাটা কি তাহ'লে ঠিক না ?'

'যাঁর কাছে শুনেছেন, তাঁকেই জিগেস করুন।'

আমি আর কিছু বললুম না, কিন্তু ভিতরে-ভিতরে মনটা কেমন হালকা লাগলো। যে-বীণা কাল অমন ক'রে বললো যে, রমেনকে সে জীবনেও ভুলতে পারবে না, আজ যদি তারই মুখে শুনতে হ'তো যে, সে স্বেচ্ছায় এক নবীন মুন্সেফকে বিয়ে করতে যাচ্ছে, তাহ'লে কি খুবই দুঃখের কথা হ'তো না ? কিন্তু কেন—দুঃখই-বা কিসের, এ-রকম কি সংসারে হয় না ? খুব হয় ;

রোজই হচ্ছে—আর এতে দোষই-বা কী ? অন্যদের যদি-বা দোষ দেয়া যায়, বীণার কোনো দোষের কথা ওঠেই না—রমেন মা-একবার আসে, না-একটা খবর নেয়, বোধহয় রুথকে নিয়েই মশগুল—স্কাউণ্ড্রেল। আমার যদি হাত থাকতো আমি ওকে কানে ধ'রে টেনে এনে বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে দিতুম—কিন্তু আমিই-বা এত ভাবছি কেন, আমার কোন দায় ? এই-না আমি কাল রাত্রেই···আমিই-না প্রতিজ্ঞা করলুম যে, এখানেই দাঁড়ি টানবো ? সত্যি···কী করছি আমি এখানে, কেনই-বা রোজ আসি, কী কুক্ষণেই 'নব নীড়' নাটক হয়েছিলো ! আমার এখন প্র্যাকটিস গ'ড়ে তোলবার সময়, অন্য কোনো দিকে তাকানোই উচিত না। নাঃ—হঠাৎ আমার কথাটা মনে হ'লো—কলকাতা না ছাড়লে আমার পরিত্রাণ নেই। যাই না কয়েকদিন দারজিলিং ঘুরে আসি—তারপর নতুন উদ্যম, নতুন মন নিয়ে কাজে বসবো—হ্যাঁ, এইটে ঠিক বুদ্ধি এসেছে মাথায়।

নিজের ভাবনায় মগ্ন ছিলুম, হঠাৎ বীণার স্বর কানে এলো, 'কী ভাবছেন ?'

সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দিলুম, 'আমি দারজিলিং যাচ্ছি।' কথাটা নিজের কানেই বেখাপ্পা শোনালো।

'কেন ?'

'এমনি—বেড়াতে।'

'কবে যাচ্ছেন ?' ব'লে ফেললুম, 'জুন মাস পড়লেই যাবো।'

'তার মানে—শিগগিরই ?'

'শিগগিরই।'

বীণা হঠাৎ দাঁড়িয়ে বললো, 'একটু দাঁড়ান—বড়দি অনেক পিছিয়ে পড়েছেন।'

আর কী! সাত দিন পরেই যখন দারজিলিং যাচ্ছি, তখন এ-ক'দিনের জন্য আর নিয়মভঙ্গ ক'রে কী হবে। রোজই যাচ্ছি, এবং লেকে বেড়ানোটাও নিত্যনৈমিত্তিক হ'য়ে উঠেছে। এ-বিষয়ে বড়দিরই উৎসাহ, লেকে পাড়ার অনেকের সঙ্গেই তাঁর দেখা হয়, আমাদের ফেলে তাঁদের সঙ্গেই আড্ডা জমান তিনি। আমি আর বীণা খানিকটা হাঁটি, খানিকটা বসি, কখনো গল্প করি, কখনো চুপ ক'রে থাকি। এ-ক'দিনে পৃথিবীর অনেক বিষয়েই আমরা আলোচনা করেছি, এবং আশ্চর্যের বিষয় এইটে দেখা গেছে যে, পৃথিবীর অনেক বিষয়েই আমরা একমত।

জুন মাসের পয়লা তারিখে বীণা জিগেস করলো, 'কবে যাচ্ছেন ?'

'যাচ্ছি ? কোথায় ?'

'তাহ'লে, দারজিলিং যাচ্ছেন না।'

লজ্জার ভাবটা চাপা দেবার জন্য অনর্থক কথা বললুম—'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, যাচ্ছি বইকি, এখন একটা জরুরি কেস হাতে আছে, তাই—'

'ঠিকই যাবেন?'

'নিশ্চয়ই!' কথাটা বার-বার বলতে-বলতে আমার নিজেরই জেদ চাপলো—হ্যাঁ, যাওয়াই চাই।

বীণা লেকের জলের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বললো, 'না, যাবেন না।'

'যাবো না! আপনি বলছেন কী!' নিজের কানেই ধরা পড়লো আমার গলায় কাঁপুনি।

'না, যাবেন না,' বীণা আবার বললো। 'আপনি তো জানেন না—বড়দিরা সত্যি-সত্যি—সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন—এই উনতিরিশে তারিখেই—কিন্তু আমি পারবো না—ঐ প্যাণ্ট-পরা মুন্সেফকে বিয়ে করতে পারবো না আমি—'

বিশেষণটা আমার কানে ভালো ঠেকলো না, কেননা, আমিও নিয়মিতই শ্বেতাঙ্গ বেশ ধারণ ক'রে থাকি, ডাক্তারদের ওটা করতেই হয়। গম্ভীরভাবে বললুম, 'প্যাণ্ট পরলে রমেনের মতো ভালো কি আর সকলকে দেখায়, তাই ব'লে—'

বীণা আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো, 'তাই ব'লে এই ক্যাবলাকান্ত কে না কে!'

অভিভাবকের ভাব ধ'রে বললুম, 'একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে কি ও-রকম বলা উচিত?'

'তা, ভদ্রলোক ভদ্রলোকের মতো থাকলেই পারেন! আপনি দেখবেন, দিদিরা যা ভাবছেন তা কিছুতেই হবে না।'

'কিন্তু, বিয়ে তো আপনাকে করতেই হবে।'

'করতেই হবে কেন ?'

'আপনি তো ছেলেমানুষ নন—আপনি তো বোঝেন সব।'

'আপনিও এই কথা বলেন !' ব'লে বীণা আবার জলের দিকে তাকালো। একবার ওর চোখের দিকে তাকালুম আমি, একবার জলের দিকে! মনে হ'লো দুটো একই ধরনের জিনিশ—কালো আর শাদা, ছলছলে আর ভিজে-ভিজে।

হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে বীণা বললো, 'না—আমি পারবো না—আপনি যাবেন না, আমাকে বাঁচান।'

'আমি ! আমি কী ক'রে বাঁচাবো আপনাকে ?'

ব'লেই বুঝলুম, এই প্রশ্ন একেবারেই অনর্থক, অনেক আগেই বীণা তার জবাব দিয়েছে।...

সুখবর পেয়ে সকলের আগে ছুটে এলো রমেন। এসেই প্রকাণ্ড তিন লাফ দিলো, আমাকে জড়িয়ে ধ'রে শূন্যে তুললো, চাকরদের ডেকে বকশিষ দিলো পাঁচ-পাঁচ টাকা—তারপর ঝড়ের মতো বেরিয়ে গিয়ে, ঝড়ের মতো ফিরে এলো ঘণ্টা-খানেক পরে। পান্না-বসানো আংটি আর রুপোর কাজ-করা বেনারসি আমার হাতে দিয়ে বললো, 'এই রইলো তোমার অধিবাসের তত্ত্ব—ও-বেলা যেয়ো শৈলেশদার ওখানে—ওঁরা আজই এলেন।'

শৈলেশদার সঙ্গে দেখা হ'তেই তিনি মুচকি হেসে বললেন, 'কী হে, কী সব শুনছি?'

'নব নীড় তাহ'লে তোমার কপালেই সার্থক হলো!' বললেন গায়ত্রী দেবী।

শৈলেশবাবু বললেন, 'তা-ই দেখছি! অবনীর নব নীড়—বাঃ, বেশ মিলেও গেলো!'

'মিলবে না! যা মিল ওরা বানিয়েছে, এখন তো মুখে-মুখে মিলে যাবে।'

স্বামী-স্ত্রীতে এমনি চালালেন খানিকক্ষণ, আমি লাল হ'য়ে বোকার মতো হাসতে লাগলুম। যা কাটলো সেই কয়েকটা দিন! একদিকে দুই শ্যালিকার চোখা-চোখা বাক্যবাণ—এখানেও শৈলেশবাবু একটা মিল দিয়ে বললেন যে, ভাগ্যবানের কপালেই বাক্যবাণ জোটে—অন্যদিকে অন্য সব ব্যবস্থা—নতুন বাড়ি খুঁজে বের করা, সংসারে দরকারি সব জিনিশপত্র কেনা—রমেন আমার সঙ্গে-সঙ্গে ঘুরে সব ঠিক ক'রে দিলো, নয়তো আমি একা কি পারতুম! আর তারপর—তারপর আর কী, সেই উনতিরিশে জ্যৈষ্ঠ। নতুন বাড়িতে এলুম, রমেন সকাল থেকে ব'সে আছে—সে-ই বরপক্ষের সোল রেপ্রেজেন্টেটিভ—তার সুন্দর মুখের উৎসাহে জলজলে চেহারা আজও আমার মাঝে-মাঝে মনে পড়ে—আর হঠাৎ মনটা একটু খারাপও হ'য়ে যায়। সে-ই তো জাগিয়েছিলো বীণাকে—আর আমি পেয়েছিলুম। আমি কি তাহ'লে হাতের-কাছে-পাওয়া

জিনিশমাত্র ছিলাম? আমি না-হ'য়ে অন্য কেউ কাছে এসে পড়লেও এ-ই হ'তো? আমার বদলে সেই প্যান্ট-পরা মুন্সেফও? বিয়ের পরে বীণাকে জিগেস করেছিলুম কথাটা, সে রীতিমতো বৌ-বৌ ভাব ক'রে জবাব দিয়েছিলো—যাওঃ! তারপর এও বলেছিলো যে, রমেনকে নিয়ে যে-কাণ্ড সে করেছিলো তা ভাবতে এখন তার হাসি পায়। হাসি পায়? এখনই? তাহ'লে দৈবাৎ যদি আমার সঙ্গে তখন বিয়ে না হ'তো, তাহ'লে আবার কয়েক মাস পরে—কিন্তু ঐ-সব বাজে কথা ভেবে লাভ কী, বীণাকে নিয়ে দিব্যি সুখেই তো জীবনটা কেটে গেলো।

ডাক্তারের এই জবানবন্দি সোৎসাহে গৃহীত হ'লো। কনট্র্যাক্টরের খানিক আগে হয়তো ঝিমুনি এসেছিলো, কিন্তু 'নব নীড়ে'র ঘটনাবলী শুনতে-শুনতে তিনি সশব্দে হেসে উঠলেন কয়েকবার, আর দিল্লিওলার সুগঠিত ঠোঁটেও কৌতুকের ক্ষীণ রেখা মাঝে-মাঝেই দেখা দিলো। শুধু সাহিত্যিকটি যেন নিঃসাড়—পকেটে হাত ঢুকিয়ে মাথা এলিয়ে চুপ—কিন্তু ডাক্তার থামার পরে তিনিই প্রথম কথা বললেন।

'এটা ঘটকালির গল্প হ'লো, প্রেমের গল্প না।'

'ঠিক আছে,' জবাব দিলেন দিল্লিওলা। 'এর পরে প্রেমের গল্প আপনার মুখে শুনবো।'

'ক-টা বাজলো?'

'প্রায় তিনটে।'

'প্রায় তিনটে। ওঃ, রাত কী লম্বা! শীত কী প্রচণ্ড! আমাদের গাড়ি আসবার কোনো খবর নেই এখনো?'

'কিচ্ছু না!'

'তাহ'লে এখন ঘুমের চেষ্টা করা যাক—ব'সে-ব'সেই মন্দ কী!'

রাত-জাগা ভাঙা গলায় কনট্র্যাক্টর বললেন, 'উহুঁ'—এখন আর ফাঁকি দিলে চলবে না। এবার আপনার পালা, আরম্ভ করুন।'

সাহিত্যিক হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন, পকেট থেকে বের ক'রে হাতে হাতে ঘষলেন, ঘরের মধ্যে খুব জোরে পায়চারি করলেন কয়েকবার। তারপর আবার ব'সে বদমেজাজি আওয়াজে বললেন, 'প্রেমের গল্প? এই শীতে! আচ্ছা:'

সাহিত্যিকের স্বগতোক্তি

আমরা তিনজন একসঙ্গে তার প্রেমে পড়েছিলাম: আমি আর অসিত আর হিতাংশু; ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশে। সেই ঢাকা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘে-ঢাকা সকাল!

এক পাড়ায় থাকতাম তিনজন। পুরানা পল্টনে প্রথম বাড়ি উঠেছিলো তারা-কুটির, সেইটে হিতাংশুদের। বাপ তার

পেন্সন-পাওয়া সব-জজ, অনেক পয়সা জমিয়েছিলেন, এবং মস্ত বাড়ি তুলেছিলেন একেবারে বড়ো রাস্তার মোড়ে। পাড়ার পয়লা নম্বর বাড়ি তারা-কুটির, দু-অর্থেই তা-ই, সবচেয়ে আগেকার এবং সবচেয়ে ভালো। ক্রমে-ক্রমে আরো অনেক বাড়ি উঠে ঘাস আর লম্বা-লম্বা চোরকাঁটা-ছাওয়া মাঠ ভ'রে গেলো, কিন্তু তারা-কুটিরের জুড়ি আর হ'লো না।

আমরা এসেছিলাম কিছু পরে, অসিতদের বাড়ির তখন ছাদ পিটোচ্ছে। একটা সময় ছিলো, যখন ঐ তিনখানাই বাড়ি ছিলো পুরানা পল্টনে; বাকিটা ছিলো এবড়োখেবড়ো জমি, ধুলো আর কাদা, বর্ষায় গোড়ালি-জলে গা-ডোবানো হলদে-হলদে-সবুজ রঙের ব্যাং আর নধর সবুজ ভিজে-ভিজে ঘাস। সেই বর্ষা, সেই পুরানা পল্টন, সেই মেঘ-ডাকা দুপুর।

আমরা তিনজন একসঙ্গে থাকতাম সবসময়—যতটা এবং যতক্ষণ একসঙ্গে থাকা সম্ভব। রোজ ভোরবেলায় আমার শিয়রের জানলার বাইরে দাঁড়িয়ে অসিত ডাকতো, 'বিকাশ! বিকাশ!' আর আমি তাড়াতাড়ি উঠে বাইরে আসতাম; দেখতাম, অসিত সাইকেলে ব'সে আছে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে—এমন লম্বা ও, ওর কাঁধে হাত রাখতে কনুই ধ'রে যেতো আমার। হিমাংশুকে ডাকতে হ'তো না, দাঁড়িয়ে থাকতো তাদের বাগানের ছোটো ফটকের ধারে, কি ব'সে থাকতো বাগানের নিচু দেয়ালে পা ঝুলিয়ে, তারপর অসিত সাইকেলে চেপে চ'লে যেতো পাকা

সড়ক ধ'রে স্কুলে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে, আমি আর হিতাংশু ঘুরে-ঘুরে বেড়াতাম হাতে হাত ধ'রে, হাওয়ার গন্ধ, যেন কিসের, যেন কার, সে-গন্ধ আজও যেন পাই, কী মনে পড়ে, কাকে মনে পড়ে।

বিকেলে দুটি সাইকেলে তিনজনে চ'ড়ে প্রায়ই আমরা শহরে যেতাম, কোনোদিন বিখ্যাত ঘোষবাবুর দোকানে চপ-কটলেট খেতে, কোনোদিন শহরের একটিমাত্র সিনেমায়, কোনোদিন চিনেবাদাম পকেটে নিয়ে নদীর ধারে। সাইকেল চালানোটা আমার জীবনে হ'লো না—চেষ্টা ক'রেও শিখতে পারিনি ওটা—কিন্তু ঐ দু-চাকার গাড়িতে চড়েছি অনেক, কখনো অসিতের, কখনো হিতাংশুর গলগ্রহ হ'য়ে লম্বা-লম্বা পাড়ি দিয়েছি তাদের পিছনে দাঁড়িয়েই। আবার কত সন্ধ্যা কেটেছে পুরানা পল্টনেরই মাঠে, ঘাসের শোফায় শুয়ে ব'সে, ছোটো-ছোটো তারা ফুটেছে আকাশে, চোরকাঁটা ফুটেছে কাপড়ে, হিতাংশুদের সামনের বারান্দার লণ্ঠনটা মিটমিট করেছে দূর থেকে। এ-সময়টা হিতাংশু বেশিক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকতো না—আটটার মধ্যে তাকে ফিরতেই হ'তো বাড়িতে। অত কড়া শাসন আমার উপর ছিলো না, অসিতেরও না, দু'জনে ব'সে থাকতাম অন্ধকারে, ফেরবার সময় আস্তে একবার ডাকতাম হিতাংশুকে, পড়া ফেলে উঠে এসে চুপি-চুপি দু-একটা কথা ব'লেই সে চ'লে যেতো।

আমরা তিনজন তিনজনের প্রেমে পড়েছিলাম, আমার

তিনজন একসঙ্গে অন্য-একজনের প্রেমে পড়লাম, সেই ঢাকায়, পুরানা পল্টনে, উনিশ-শো সাতাশ সনে।

নাম তার—অন্তরা। তখনকার ঢাকার পক্ষে নামটি অত্যন্তই শৌখিন। কিন্তু ঢাকার মতো কিছুই তো তাঁদের নয়, মেয়ের নামই-বা হবে কেন। ভদ্রলোক প্রচণ্ড সাহেব—আমাদের তখন তা-ই মনে হ'তো—আর ভদ্রমহিলা এমন সাজেন যে, পিছন থেকে হঠাৎ তাঁকে তাঁর মেয়ে ব'লে ভুল হয়। আর তাঁর মেয়ে, তাঁদের মেয়ে, তার কথা আর কী বলবো। সে সকালে বাগানে বেড়ায়, দুপুরে বারান্দায় ব'সে থাকে বই কোলে নিয়ে, বিকেলে রাস্তায় হাঁটে প্রায় আমাদের গা ঘেঁষেই, সব-সময় দেখা যায় তাকে, মাঝে-মাঝে শোনা যায় গলার আওয়াজ—সেই ঢাকায়, সুদূর সাতাশ সনে, কোনো একটি মেয়েকে চোখে দেখাও যখন সহজ ছিলো না, যখন বন্ধ-গাড়ির দরজার ফাঁকে একটুখানি শাড়ির পাড় ছিলো আমাদের স্বর্গের আভাস, তখন—এই যে মেয়ে, যাকে দেখতে পাই এক-একদিন এক-এক রঙের শাড়িতে, আর তার উপর নাম যার অন্তরা, তার প্রেমে পড়বো না এমন সাধ্য কী আমাদের!

নামটা কিন্তু বের করেছিলাম, আমি। রোজ সই ক'রে পাঁউরুটি রাখতে হয় আমাকে, একদিন রুটিওলার খাতায় নতুন একটি নাম দেখলাম নীল কালিতে বাংলা হরফে পরিষ্কার ক'রে লেখা—'অন্তরা দে।' একটু তাকিয়ে থাকলাম লেখাটুকুর দিকে,

খাতা ফিরিয়ে দিতে একটু দেরিই করলাম, তারপর বিকেলে হিতাংশুকে বললাম, 'নাম কি, অন্থুরা ?'

'কার—?' কিন্তু তক্ষুনি কথাটা বুঝে নিয়ে হিতাংশু বললো, 'বোধ হয়।'

অসিত বললো, 'তাকে তরু ব'লে।'

তরু ! এই ঢাকা শহরেই দু'তিনশো অন্তত তরু আছে, কিন্তু সে-মুহূর্তে আমার মনে হ'লো, এবং আমি বুঝলাম, অসিতেরও মনে হ'লো যে, সমস্ত বাংলা ভাষায় তরুর মতো এমন একটি মধুর শব্দ আর নেই। তা হোক, হিতাংশুর একটু বাজে কথা বলাই চাই, কেননা যাকে নিয়ে, বা যাদের নিয়ে কথা হচ্ছে, ওদেরই বাড়ির একতলায় তারা ভাড়াটে, আমাদের চাইতে বেশি না-জানলে ওর মান থাকে না। তাই ও নাকের বাঁশিটা একটু কুঁচকে বললো, 'অন্থুরা থেকে তরু—এটা কিন্তু আমার ভালো লাগে না।'

'ভালো না কেন, খুব ভালো।' গলা চড়িয়ে দিলাম, কিন্তু ভিতরটা কেমন দ'মে গেলো।

'আমি হ'লে, অন্থুরাই ডাকতাম।'

কী সাহস ! কী দুঃসাহস ! তুমি ডাকতে, তাও আবার নাম ধ'রে ! ঈশ ! প্রতিবাদের তাপে আমার মুখ গরম হ'য়ে উঠলো, বেশ চোখা-চোখা কয়েকটা কথা মনে-মনে গোছাচ্ছি, ফশ ক'রে অসিত ব'লে উঠলো, 'আমিও তাই।'

বিশ্বাসঘাতক !

এ-রকম ছোটো-ছোটো ঝগড়া প্রায়ই হ'তো আমাদের। এমন দিন যায় না যেদিন ওকে নিয়ে কোনো কথা না হয়, আর এমন কোনো কথা হয় না যাতে তিনজনেই একমত হ'তে পারি। সেদিন যে নীল শাড়ি পরেছিলো তাতেই ভালো দেখাচ্ছিলো, না, কালকের বেগনি রঙেরটায়; সকালে যখন বাগানে দাঁড়িয়েছিলো তখন পিঠের উপর বেণী দুলছিলো, না, চুল ছিলো খোলা; বিকেলে বারান্দায় ব'সে কোলের উপর কাগজ রেখে কি চিঠি লিখছিলো, না, আঁক কষছিলো—এমনি সব সমস্যা নিয়ে চ্যাঁচামেচি ক'রে আমরা গলা ফাটাতাম। সবচেয়ে বেশি তর্ক হ'তো যে-কথা নিয়ে সেটা একটু অদ্ভুত: ওর মুখের সঙ্গে 'মোনা লিসা'র মিল কি খুব বেশি, না, অল্প-একটু, না, কিছুই না। আমি তখন প্রথম মোনা লিসার ছাপা ছবি দেখেছি এবং বন্ধুদের দেখিয়েছি; হঠাৎ একদিন আমারই মুখ দিয়ে বেরোলো কথাটা—বললাম, 'ওর মুখ অনেকটা মোনা লিসার মতো।' তারপর এ নিয়ে অসংখ্য কথা খরচ করেছি আমরা, কোনো মীমাংসা হয়নি, তবে একটা সুবিধে এই হ'লো যে, আমাদের মুখে-মুখে ওর নাম হ'য়ে গেলো, 'মোনা লিসা'। অন্তরাতে যতই সুর করুক, তরুতে যতই তরুণতা, যে-নামে ওকে সবাই ডাকে সে-নামে তো আমরা ওকে ভাবতে পারি না—অন্য একটি নাম, যা আমরা শুধু জানি আর-কেউ জানে না, এমন একটি নাম পেয়ে আমরা যেন ওকেই পেলাম।

হিতাংশুকে প্রায়ই বলতাম, 'তোমার সঙ্গে একদিন আলাপ হবেই—একই তো বাড়ি', আর হিতাংশুও একটু লাল হ'য়ে বলতো, 'যাঃ!' যার মানে হচ্ছে যে, সেটা হ'লেও হ'তে পারে—আর তা নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনাই চলতো আমাদের, কিন্তু মনে-মনে আমরা ধ'রেই নিয়েছিলাম যে, এ-সব কিছু না, শুধুই কথা, কথার কথা।

একদিন সন্ধ্যার পরে তিনজনেই ফিরছি সাইকেলে রমনা বেড়িয়ে, আমি হিতাংশুর পিছনে। নির্জন পথে নিশ্চিন্তে গল্প চালিয়েছি, হঠাৎ হিতাংশু কথা বন্ধ ক'রে সাইকেলের উপর কী-রকম কেঁপে উঠলো, সঙ্গে-সঙ্গে আমি প্রায় প'ড়ে যাচ্ছিলাম ওর সাইকেলের পিন থেকে, টাল সামলাতে গিয়ে টেনে ধরলাম হিতাংশুর জামার গলা, 'উঃ' ব'লে সে নেমে পড়লো, আমিও পায়ের তলায় মাটি পেলাম। সঙ্গে-সঙ্গে মোটা-গলায় একজন ব'লে উঠলেন, 'Take care, young man!' তাকিয়ে দেখি ঠিক আমাদের সামনে দে-সাহেব দাঁড়িয়ে, আর তাঁর স্ত্রী আর কন্যা। অসিত সাইকেলটা একটু ঘুরিয়ে এক পা মাটিতে ঠেকিয়ে চুপ ক'রে আছে, মুখের ভাবটা বেশ বীরের মতো।

'Really you must—' বলতে-বলতে দে-সাহেব হিতাংশুর মুখের উপর চোখ রাখলেন।—'Oh, it's you! কেশববাবুর ছেলে!'

আমি স্পষ্ট দেখলাম, হিতাংশুটা বোকার মতো ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছে।

'আর এরা—তিনজনকে একসঙ্গেই তো দেখতে পাই সব-সময়। বন্ধু বুঝি? বেশ, বেশ। I like young men. এসো একদিন আমাদের ওখানে তোমরা।'

ওঁরা চ'লে গেলেন। আমরা রাস্তা ছেড়ে মাঠে নেমে ঘাসের উপর পাশাপাশি শুয়ে পড়লাম লম্বা হ'য়ে। একটু পরে অসিত বললো, 'কী কাণ্ড!...হিতাংশু ঘাবড়ে গিয়েছিলে, না?'

'না তো! ঘাবড়াবো কেন? ব্রেকটা হঠাৎ—'

'কোনোদিন এ-রকম হয় না। আর আজ কিনা একেবারে ওঁদের সামনে—'

'বেশ তো! হয়েছে কী তাতে? কারো গায়েও পড়িনি, প'ড়েও যাইনি! হঠাৎ ব্রেকটা কষতে গিয়ে—'

'না, না, তুমি তো ঠিকই নেমেছিলে, তবে তোমার মুখটা যেন কেমন হ'য়ে গিয়েছিলো। আর বিকাশ তো—'

আমার নাম করতেই আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, 'চুপ করো! ভালো লাগে না!'

'ও বোধহয় একটু হেসেছিলো,' অসিত তবু ছাড়লো না। ('ও' বলতে কাকে বোঝায় তা বোধহয় না-বললেও চলে।)

'হেসেছিলো তো ব'য়ে গেলো!' চীৎকার ক'রে বললো হিতাংশু, কিন্তু সে-চীৎকার যেন কান্না।

'তুমি দেখেছিলে, বিকাশ? ঠিক মোনা লিসার হাসির মতো কি?'

'যা বোঝো না, তা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না!' বলতে গিয়ে আমার গলা ভেঙে গেলো। সে-রাত্রে ভালো ঘুমোতে পারলাম না, দু-দিন আধ-মরা হ'য়ে থাকলাম, সাতদিন মন-মরা।

রাগ করি আর যা-ই করি, আমাদের মধ্যে অসিতটাই তুখোড়। সে কেবলই বলতে লাগলো—'চ'লো না একদিন যাই আমরা ওঁদের ওখানে।'

'পাগল নাকি!'

'কেন? দে-সাহেব বললেন তো যেতে। বললেন না?'

ক্রমে-ক্রমে হিতাংশুর আর আমারও ধারণা জন্মালো যে, দে-সাহেব সত্যিই আমাদের যেতে বলেছেন, প্রায় নিমন্ত্রণই করেছেন, আমরা গেলে রীতিমতো সুখী হবেন তিনি, না-গেলে এমনকি তাঁকে অসম্মানই করা হবে। তাঁর সম্মানরক্ষার জন্য আমরা ক্রমশই বেশি ব্যস্ত হ'তে লাগলাম। রোজ সকালে স্থির করি, 'আজ', রোজ বিকেলে মনে করি, 'আজ থাক।' কোনোদিন দেখি ওঁরা বাগানে বসেছেন বেতের চেয়ার টেনে; কোনোদিন বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো দেখেই বুঝি—শহরের একমাত্র ব্যারিস্টর দাস-সাহেব বেড়াতে এসেছেন; আর কোনোদিন-বা চুপচাপ দেখে ধ'রে নিই ওঁরা বেরিয়েছেন। দৈবাৎ একদিন হয়তো চোখে পড়ে দে-সাহেব

একা ব'সে খবর-কাগজ পড়ছেন, মনে হয় এইটে ভারি সুসময়, কিন্তু বাগানের গেটের সামনে পা থমকে যায় আমাদের, অসিতের ততটা নয় যতটা হিতাংশুর, হিতাংশুর ততটা নয় যতটা আমার; একটু ঠেলাঠেলি ফিশফিশানি হয়, আর শেষ-পর্যন্ত 'তারা-কুটির' ছাড়িয়ে মোড় ঘুরে আমরা চ'লে যাই। কেবলই মনে হয় এখন গেলে বিরক্ত হবেন, আবার তখনই ভাবি—বিরক্ত কিসের, আর এ নিয়ে এত ভাববারই-বা কী আছে, মানুষ কি মানুষের সঙ্গে দেখা করে না! আমরা চোরও নই, ডাকাতও নই, যাবো, বসবো, আলাপ করবো, চ'লে আসবো—ব্যস!

সেদিন আকাশে মেঘ, টিপটিপ বৃষ্টি। বাইরে থেকে দেখে মনে হ'লো, ওঁরা বাড়িতেই আছেন। ছোট্ট গেট ঠেলে সকলের আগে ঢুকলো অসিত, লম্বা, ফর্শা, সুশ্রী, তারপর হিতাংশু, গম্ভীর, চশমা-পরা, ভদ্রলোক-মাফিক, আর সকলের শেষে পুঁচকে আমি। বাগান পার হ'য়ে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম আমরা, কাউকে ডাকবো কিনা, কাকে ডাকবো, কী ব'লে ডাকবো, এইসব ভাবতে-ভাবতেই পরদা ঠেলে দে-সাহেব নিজেই বেরিয়ে এলেন। দাঁতের ফাঁকে মোটা পাইপ চেপে ঘাঁৎ ক'রে বললেন, 'Yes?'

এই বিজাতীয় সম্ভাষণে সপ্রতিভ অসিতও একটু বিচলিত হ'লো। 'আমি—আমরা—মানে আমরা এসেছিলাম—আপনি বলেছিলেন—'

আবছা-আলোয় তখন দে-সাহেব আমাদের চিনলেন। 'ও, তোমরা! তা……'

অসিত আবার বললো, 'আপনি বলেছিলেন আমাদের একদিন আসতে।'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ…তা' একটু কেশে—'এসো, এসো তোমরা,' পরদা সরিয়ে দরজার ধারে দাঁড়ালেন দে-সাহেব, আমরাও দাঁড়িয়ে থাকলাম।

'যাও, ভিতরে যাও।'

ঢুকতে গিয়ে হিতাংশু তার নিজেরই বাড়ির চৌকাঠে হোঁচট খেয়ে আমার পা মাড়িয়ে দিলো, আমার লাগলো খুব, কিন্তু তখন চুপ ক'রে থাকা ছাড়া আর উপায় কী। আমাদের কাদা-মাখা জুতোয় ঝকঝকে মেঝে নোংরা ক'রে-ক'রে এগিয়ে এলাম আমরা। কী সুন্দর সাজানো ঘর, এমন কখনো দেখিনি। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। সামনের দিকে সোফায় ব'সে মিসেস দে উল বুনছেন, আর দেয়ালের সঙ্গে ঠেকানো কোণের চেয়ারটিতে ব'সে আছে আমাদের মোনা লিসা, কোলের উপর মস্ত মোটা নীল মলাটের বইয়ের পাতায় চোখ নামিয়ে।

দে-সাহেব বললেন, 'সুমি, এই যে পুরানা পল্টনের শ্রী মস্কোটিঅর্স। এটি হচ্ছে কেশববাবুর ছেলে, আর এরা…'

হিতাংশু পরিচয় করিয়ে দিলো, 'এর নাম অসিত; আর এই হচ্ছে—বিকাশ।'

মিসেস দে মৃদু হেসে মৃদু বললেন, 'তিন বন্ধু বুঝি তোমরা ? বেশ, বেশ, রোজই তো দেখি তোমাদের। বোসো।'

একটা লম্বা সোফায় ঝুপঝুপ ব'সে পড়লাম তিন জনে। মিসেস দে ডাক দিলেন, 'তরু !'

মোনা লিসা চোখ তুললো।

'এঁরা আমাদেরই প্রতিবেশী—আর এই আমার মেয়ে।'

মোনা লিসা বই রেখে উঠলো, ছিপছিপে সবুজ একটি গাছের মতো দাঁড়ালো, অল্প হাওয়ায় গাছ যেমন নড়ে, তেমনি ক'রে মাথা নোয়ালো একটু, তারপর আবার চেয়ারে ব'সে বই খুলে চোখ নিচু করলো।

আমার মনে হ'লো আমি স্বপ্ন দেখছি।

অসিত কলকাতার ছেলে ; আমাদের সকলের চাইতে স্মার্ট, খবর-টবরও রাখে বেশি ; আর হিতাংশু—সে-ও তার বাবার সঙ্গে নানা দেশ ঘুরেছে, উচ্চারণ পরিষ্কার, আর তাছাড়া এই 'তারা-কুটির' তো তাদেরই বাড়ি। কথাবার্তা যা-একটু বললো, ওরাই দু-জনে, আমি মেঝের দিকে তাকিয়ে চুপ, কিছু বলতে ভরসাও হ'লো না, পাছে আমার বাঙাল-উচ্চারণ বেরিয়ে পড়ে। চোখ তুলে মোনা লিসাকে দেখে নেবার ইচ্ছা আমাকে ভিতরে-ভিতরে অস্থির ক'রে তুলছিলো, কিন্তু কিছুতেই পারছিলাম না।

ইলেকট্রিসিটি না-থাকলে জীবন কী-রকম দুর্বহ, ঢাকার মশা কী সাংঘাতিক, এ-সব কথা শেষ হবার পর মিসেস দে বললেন, 'তোমরা কি কলেজে পড়ো ?'

অসিত যথাযথ জবাব দিয়ে সগর্বে বললো, 'হিতাংশু পনেরো টাকা স্কলারশিপ পেয়েছে ম্যাট্রিকে।'

'বাঃ, বেশ, বেশ। আমার মেয়ে তো অঙ্কের ভয়ে পরীক্ষাই দিতে চায় না।'

হঠাৎ ঘরের কোণ থেকে তারের মতো একটি আওয়াজ বেজে উঠলো, 'বাবা, কীটস্ কত বছর বয়সে মারা গিয়েছিলেন ?'

দে-সাহেব আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমরা কেউ বলতে পারো ?'

অসিত ক্ষশ ক'রে বললো, 'বিকাশ নিশ্চয়ই বলতে পারবে— বিকাশ কবিতা লেখে।'

'সত্যি ?' মুখে একটি ছেলেমানুষি হাসি ফোটালেন মিসেস দে, আর মুহূর্তের জন্য—আমি অনুভব করলাম—মোনা লিসার চোখও আমার উপর পড়লো। হাত ঘেমে উঠলো আমার। কানের ভিতর যেন পিঁপিঁ আওয়াজ দিচ্ছে।

সবসুদ্ধু কতটুকু সময় ? পনেরো মিনিট ? কুড়ি মিনিট ? কিন্তু বেরিয়ে এলাম যখন, এত ক্লান্ত লাগলো, কলেজে চারটে-পাঁচটা লেকচার শুনেও তত লাগে না।

মিসেস দে জোর ক'রেই, একটা ছাতা দিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু ছাতা আমরা খুললাম না, টিপটিপ বৃষ্টিতে ভিজতে-ভিজতে মাঠের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। হঠাৎ অসিত—বকবক না-ক'রে ও থাকতেই পারে না—ব'লে উঠলো, 'কী চমৎকার ওঁরা।'

হিতাংশু সঙ্গে-সঙ্গে বললো, 'সত্যি! চমৎকার!' আমি কথা বললাম না, কোনো কথাই ভালো লাগছিলো না আমার।

একটু পরে অসিত আবার বললো, 'আজ আবার তুমি হোঁচট খেলে, হিতাংশু!'

'কখন?'

'ঘরে ঢোকবার সময়।'

'যাঃ!'

'যাঃ আবার কী। আর ঘরে ঢুকে, নমস্কার করেছিলে তো মিসেস দে-কে?'

'নিশ্চয়ই!'

একটু চুপ ক'রে থেকে হিতাংশু বললো, 'কিন্তু যখন··· মোনা লিসা যখন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলো···'

অন্ধকারে আমরা তিন বন্ধু একবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, এবং অন্ধকারেই বোঝা গেলো যে, তিনজনেরই মুখ ফ্যাকাশে হয়েছে। একটি মেয়ে, একজন ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলেন, আর আমরা কিনা জরদ্গবের মতো ব'সেই থাকলাম—উঠে দাঁড়ালাম না, প্রতিনমস্কার করলাম না, কিছু বললাম না, কিচ্ছু না। ওঁরা আমাদের বাঙাল ভাবলেন, কাঠ-বাঙাল, জংলি, বর্বর, খাশ কলকাতার ছেলে অসিত মিত্তিরও আমাদের মুখরক্ষা করতে পারলো না।

কী-যে মন খারাপ হ'লো, তা কি আর বলবার!

পরের দিন তিনজনে আবার গেলাম ছাতা ফেরৎ দিতে।

চাকর আমাদের ঘরে নিয়ে বসালো, তারপর···তারপর মোনা লিসাই এলো ঘরে, তড়াক ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করলাম। একটু হেসে বললাম, 'এই ছাতাটা···' 'ও মা! এর জন্য আবার···বসুন··।' মনে-মনে এইরকম সাজিয়েছিলাম ঘটনাটা, কিন্তু হ'লো একটু অন্য-রকম। চাকর এসে ছাতাটা নিয়ে ভিতরে চ'লে গেলো, আর ফিরে এলো না, কেউই এলো না। আমরা একটু দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নিচু ক'রে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম—কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারলাম না।

না, না। ঐ সুন্দর ক'রে সাজানো ঘরে, যেখানে শাদা ধবধবে আলোয় দেয়ালের প্রতিটি কোণ ঝক ঝক করে, যেখানে কোণের চেয়ারে ব'সে পৃথিবীর সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়েটি মস্ত মোটা বইয়ের পাতা ওল্টায়, সেখানে জায়গা নেই আমাদের। কিন্তু তাতে কী। মোনা লিসা—মোনা লিসাই।

ঝমঝম ক'রে বর্ষা নামলো পুরানা পল্টনে, মেঘে ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুরুদুরু দুপুর, নীল জ্যোছনায় ভিজে-ভিজে রাত্রি। পনেরো দিন ধ'রে প্রায় অবিরাম বৃষ্টির পরে প্রথম যেদিন রোদ উঠলো, সেদিন বাইরে এসে দেখি, শহরের সবচেয়ে বড়ো ডাক্তারের গাড়ি তারা-কুটিরের সামনে দাঁড়িয়ে।

হিতাংশুকে জিগেস করলাম, 'তোমাদের বাড়িতে কারো অসুখ নাকি?'

'না তো!'

তবে কি ওদের বাড়িতে—প্রশ্নটা উচ্চারিত না-হ'য়েও ব্যক্ত হ'লো। পরের দিন হিতাংশু গম্ভীর মুখে বললে, 'ওদের বাড়িতেই অসুখ?

'কার?'

'ওরই অসুখ?'

'ওর অসুখ!'

'ওর!'

সেদিনও বড়ো ডাক্তারের গাড়ি দেখলাম, তার পরদিন দু-বেলা। আমরা কি একবার যেতে পারি না, খবর নিতে পারি না, কিছু করতে পারি না? ঘুরঘুর করতে লাগলাম রাস্তায়, ডাক্তারের গাড়ির আড়ালে। ডাক্তার বেরিয়ে এলেন, দে-সাহেব সঙ্গে-সঙ্গে গেট পর্যন্ত। আমাদের চোখেই দেখলেন না তিনি, তারপর হঠাৎ দেখতে পেয়ে বললেন, 'তোমরা একবার যাও তো ভিতরে, উনি একটু কথা বলবেন।'

সিঁড়ির উপরের ধাপে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিসেস দে, একটা সিঁড়ি নিচে দাঁড়িয়ে অসিত বললো, 'আমাদের ডেকেছেন, মাসিমা?' কলকাতার ছেলে, ডাক-টাকগুলো দিব্যি আসে, আমি ম'রে গেলেও ও-সব পারি না।

মিসেস দে ভারি-গলায় বললেন, 'তরুর অসুখ।'

'কী অসুখ?'

'টাইফয়েড।' ঐ ভয়ংকর শব্দটা আস্তে উচ্চারণ ক'রে তিনি বললেন, 'আমার কিছু ভালো লাগছে না।'

অসিত ব'লে উঠলো, 'কিছু ভাববেন না। আমরা সব ক'রে দেবো।'

'পারবে, পারবে তোমরা? দ্যাখো বাবা, এই একটাই সন্তান আমার'···বলতে-বলতে চোখ তাঁর জলে ভ'রে এলো।

শোনা লিসা, কোনোদিন জানলে না তুমি, কোনোদিন জানবে না. কী ভালো আমাদের লেগেছিলো, কী সুখী আমরা হয়েছিলাম, সেই সাতাশ সনের বর্ষায়, পুরানা পল্টনে, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, সেই জ্বরে, ঝড়ে, বৃষ্টিতে, থমথমে অন্ধকারে, ছমছমে ছায়ায়। দেড় মাস তুমি শুয়ে ছিলে, দেড় মাস তুমি আমাদের ছিলে। দেড় মাস ধ'রে সুখের স্পন্দন দিনে-রাত্রে কখনো থামলো না আমাদের হৃৎপিণ্ডে। তোমার বাবা আপিশ যান, ফিরে এসে রোগীর ঘরে একবার উঁকি দিয়েই হাত-পা এলিয়ে শুয়ে পড়েন ইজি-চেয়ারে; তোমার মা-র সারাদিনে ফুরশৎ নেই, কিন্তু রাত্তিরে আর পারেন না তিনি, রোগীর ঘরেই ক্যাম্পখাটে ঘুমোন; আর সারারাত পালা ক'রে-ক'রে জেগে থাকি আমরা, কখনো একসঙ্গে দু'জনে, ক্বচিৎ তিনজনেই, বেশির ভাগ একলা একজন। আর তোমাকে নিয়ে এই একলা রাত-জাগার সুখ আমিই পেয়েছি সবচেয়ে বেশি—অসিত সারাদিন ছুটোছুটি করেছে সাইকেলে, হিতাংশুও বার-বার, সবচেয়ে কাছের বরফের দোকান এক মাইল দূরে, ওষুধের দোকান দু'মাইল, ডাক্তারের বাড়ি সাড়ে-তিন মাইল—কোনোদিন অসিত দশ

বার যাচ্ছে, দশ বার আসছে, কতবার ভিজে কাপড় শুকোলো গায়ে, কোনোদিন রাত বারোটায় হিতাংশু ছুটলো বরফ আনতে, সব দোকান বন্ধ, রেলের স্টেশন নিঃসাড়, নদীর ধারে বরফের ডিপোতে গিয়ে লোকজনের ঘুম ভাঙিয়ে বরফ নিয়ে আসতে-আসতে দুটো বেজে গেলো তার; এদিকে আমি আইসব্যাগে জলের পরিমাণ অনুভব করছি বার-বার, আর অসিত বাথরুমে বরফের ছোটো-ছোটো ছড়ানো টুকরো দু'হাতে কুড়োচ্ছে। সাইকেলে আমার দখল নেই ব'লে বাইরের কাজ আমি কিছুই প্রায় পারি না, সারাদিন ঘুরঘুর করি তোমার মা-র কাছে-কাছে, হাতের কাছে এগিয়ে দিই সব, ওষুধ ঢালি, টেম্পারেচর লিখি, ডাক্তার এলে তাঁর ব্যাগ হাতে ক'রে নিয়ে আসি, নিয়ে যাই। তারপর সন্ধ্যা হয়, রাত বাড়ে, বাইরে অন্ধকারের সমুদ্র, সে-সমুদ্রে ক্ষীণ আলো-জ্বলা একটি নৌকায় তুমি আর আমি চলেছি ভেসে, তুমি তা জানলে না, মোনা লিসা, কোনোদিন জানবে না।

*

সারাদিন, সারারাত মোনা লিসা মূর্ছিতের মতো প'ড়ে থাকে, ভুল বকে মাঝে-মাঝে—এত ক্ষীণ স্বর যে, কী বলছে বোঝা যায় না—তবু যে-কটি কথা আমরা কানে শুনেছি তা-ই যত্ন ক'রে তুলে রেখেছি মনে, একের শোনা কথা অন্য দু-জনকে বলাই চাই; কখনো হঠাৎ অবসর হ'লে তিন জনে ব'সে সেই কথা ক'টি নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, যেন তিন জন কৃপণ পৃথিবীকে লুকিয়ে তাদের মণিমুক্তা ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখছে,

বন্ধ ঘরে, অন্ধকার রাত্রে। যদি বলেছে, 'উঃ,' সে যেন বাঁশির ফুঁয়ের মতো আমাদের হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেছে ; যদি বলেছে, 'জল', তাতে যেন নদীর সকল তরলতা ছলছল ক'রে উঠেছে আমাদের মনে।

এক রাত্রে, হিতাংশু বাড়ি গেছে, আর অসিত বারান্দার বিছানায় ঘুমুচ্ছে, আমি জেগে আছি একা। টেবিলের উপর জ্বলছে মোমবাতি, দেয়ালের গায়ে বড়ো-বড়ো ছায়া কাঁপছে, অন্ধকারের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে-ক'রে ঐ আলোটুকু আর যেন পারে না। আমিও আর পারছি না ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে, ডাকাতের মতো ঘুম—আমার হাত-পা কেটে টুকরো ক'রে দিলো, মোমের মতোই গ'লে যাচ্ছে আমার শরীর, যতবার চাবুক মেরে নিজেকে সোজা করছি, লাফিয়ে উঠছে অতল থেকে বিশাল ঢেউ। ডুবতে-ডুবতে মনে হ'লো, মোনা লিসা, তুমিও কি এমনি ক'রেই যুদ্ধ করছো মৃত্যুর সঙ্গে, মৃত্যু কি এই ঘুমের মতোই টানছে তোমাকে, তবু তুমি আছো, কেমন ক'রে আছো! মনে হ'তেই ঘুম ছুটলো, সোজা হ'য়ে বসলাম, তাকিয়ে রইলাম তোমার মুখের দিকে, সেই ক্ষীণ আলোয়, কাঁপা-কাঁপা ছায়ায়, রাত চারটের স্তব্ধ মহান মুহূর্তে। তুমি কি মরবে? কোনো উত্তর নেই তোমার মুখে। তোমার কি ঘুম পেয়েছে? কোনো উত্তর নেই। তুমি কি ঘুমিয়েছো, না, জেগে আছো? উত্তর নেই। তবু আমি তাকিয়ে থাকলাম,

মনে হ'লো এর উত্তর আমি পাবোই, পাবো তোমারই মুখে, তোমার মুখশ্রীতে, তোমার কণ্ঠে। আর, আমি অবাক হ'য়ে দেখলাম, আস্তে-আস্তে চোখ খুলে গেলো তোমার, মস্ত বড়ো হ'লো, পাগলের মতো ঘুরে-ঘুরে স্থির হ'লো আমার মুখের উপর, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোলো, 'কে ?'

আমি তাড়াতাড়ি তার মাথায় আইসব্যাগ দিলাম।

'কে তুমি ?'

'আমি।'

'তুমি কে ?'

'আমি বিকাশ !'

'ও, বিকাশ। বিকাশ, এখন দিন না রাত্রি ?'

'রাত্রি।'

'ভোর হবে না ?'

'হ্যাঁ, এখনই হবে।'

'ও। আমি একটু ঘুমুই, কেমন ?'

আমি তার কপালে হাত রাখলাম।

'আঃ, খুব ভালো লাগছে আমার।'

আমি বললাম, 'ঘুমোও।'

'তুমি চ'লে যাবে না তো ?'

'না।'

'যাবে না তো ?'

'না।'

তুমি ঘুমিয়ে পড়লে, আর বাইরে দু-একটা পাখি ডাকলো। ভোর হ'লো।

প্রলাপ, জ্বরের প্রলাপ, তবু এটা আমারই থাক; একলা আমার। এই একটা কথা ওদের দু-জনকে বলিনি, হয়তো ওদেরও এমন-কিছু আছে যা আমি জানি না, আর-কেউ জানে না। তুমি, মোনা লিসা, তুমি জানলে না, জানবে না কোনোদিন।

তারপর একদিন তুমি ভালো হ'লে। সে তো খুব সুখের কথা, কিন্তু আমরা যেন বেকার হ'য়ে পড়লাম। আর তুমি ভাত-টাত খাবার দিন-পনেরো পর যে-রবিবারে তোমার মা আমাদের তিন জনকে নিমন্ত্রণ ক'রে খাওয়ালেন, সেদিন আমার অন্তত মনে হ'লো যে, এই খাওয়াটা আমাদের ফেয়ারওয়েল পার্টি।

কিন্তু তা-ই বা কেন? আমরা যেতে পারি, বসতে পারি, মোনা লিসাকে গ্রামোফোন বাজিয়ে শোনাতে পারি, সে ক্লান্ত হ'লে পিঠের বালিশটাও দিতে পারি ঠিক ক'রে। এদিকে আকাশে কালো মেঘের সঙ্গে শাদা মেঘের খেলা, আর ফাঁকে-ফাঁকে নীলের মেলা, এই ক'রে-ক'রে আশ্বিন যেই এলো, ওঁরা চলে গেলেন মেয়ের শরীর সারাতে—রাঁচি। বাঁধাছাঁদা থেকে আরম্ভ ক'রে নারানগঞ্জের স্টিমারে তুলে দেয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকলাম আমরা তিনজন।

ফার্স্ট ক্লাসের ডেকে রেলিং ধ'রে দাঁড়ানো মোনা লিসার

ছবিটি যখন চোখের সামনে ঝাপসা হ'লো, তখন আমাদের মনে পড়লো যে ওঁদের রাঁচির বাড়ির ঠিকানাটা জেনে রাখা হয়নি। আমার ইচ্ছে করছিলো, বাড়ি ফিরেই একটা চিঠি লিখে ডাকে দিই, তা আর হ'লো না।

অসিত বললে, 'ওরই তো আগে লেখা উচিত।'

'তা কি আর লিখবে,' একটু হতাশভাবেই বললো হিতাংশু।

'কেন লিখবে না, চিঠি লেখায় কী আছে?'

কী আছে কে জানে, কিন্তু কুড়ি দিনের মধ্যেও কোনো চিঠি এলো না। এলো হিতাংশুর বাবার নামে মনি-অর্ডারে বাড়ি-ভাড়ার টাকা। তা-ই থেকে ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে আমরা চিঠি লিখবো স্থির করলাম, ও লেখেনি ব'লে আমরাও না-লিখে রাগ দেখাবো, এটা কোনোরকম যুক্তি ব'লেই মনে হ'লো না আমাদের। দুর্বল শরীর, হয়তো এখনো ভালো ক'রে সারেনি—কেমন আছে, সে-খবরটা আমাদেরই তো নেয়া উচিত। কিন্তু চিঠিতে পাঠ লিখবো কী? আপনি লিখবো, না, তুমি? মুখে ও অবশ্য আমাদের তুমিই বলেছে, আমরাও তা-ই, কিন্তু কতটুকু কথাই-বা এ-পর্যন্ত বলেছি আমরা—এত কথা নিশ্চয়ই বলিনি যার জোরে কালির আঁচড়ে ঝলঝলে একটা 'তুমি' লিখে ফেলা যায়। তাছাড়া, কী লিখবোই-বা চিঠিতে? কেমন, ভালো তো? এতেই তো সব কথা ফুরোলো। আমরা কেমন আছি, কী করছি, সে-সব লিখলে কত কথাই লেখা যায়—কিন্তু মোনা লিসা কি আমাদের খবর জানতে ব্যস্ত?

অনেকক্ষণ ধ'রে কথা ব'লেও কোনো মীমাংসা যখন হ'লো না, তখন ওরা আমাকেই বললো চিঠিখানা রচনা ক'রে দিতে। আমি কবিতা-টবিতা লিখে থাকি, তাই।

সে-রাত্রেই লণ্ঠনের সামনে ঘামতে-ঘামতে আমি একটা খশড়া করলাম। পাঠ দিলাম, 'সুচরিতাসু', তারপর বক্তব্যটা এই ধরনের দাঁড়ালো যে, আমরা এখানে ভেবেছিলাম চিঠি আসবে, কিন্তু চিঠি এলো না। ভাবতে-ভাবতে একুশ দিন কেটে গেলো। খুবই ভালো লাগছে বুঝি রাঁচিতে? অবশ্য ভালো লাগলেই ভালো, আমরা তাতেই খুশি। তারা-কুটিরের একতলা বন্ধ, পুরানা পল্টন তাই অন্ধকার। ওখানে পেট্রোম্যাক্স জ্বলতো কিনা রোজ সন্ধ্যায়। তা যা-ই হোক, আমরা ব'সে-ব'সে রাঁচির ছবি দেখছি। পাহাড়, জঙ্গল, লাল কাঁকরের রাস্তা, মিশকালো সাঁওতাল। হাসি, আনন্দ, স্বাস্থ্য। সত্যি, কী বিশ্রী অসুখ গেলো—আর যেন কখনো অসুখ না করে। কিন্তু কারো কোনো অসুখ না-ক'রেও এমন কি হয় না যে, আমাদের খুব খাটতে হয়? সত্যি—শুয়ে-ব'সে সময় আর কাটে না। চিঠি পেলে আবার আমাদের চিঠি লিখতে হবে, কিছু তবু কাজ জুটবে। মাসিমা-মেসোমশায়কে প্রণাম।

'আপনি-তুমি' দুটোই বাঁচিয়ে এর বেশি পারলাম না। এটুকুতেই রাত তিনটে বাজলো। তাকিয়ে দেখি, কাটাকুটির ফাঁকে-ফাঁকে এই ক'টি কথা যেন কালো জঙ্গলে ঝিকিমিকি

রোদ্দুর। বার-বার পড়লাম ; মনে হ'লো বেশ হয়েছে, আবার মনে হ'লো ছী-ছি, ছিঁড়ে ফেলি এক্ষুনি। ছিঁড়ে ফেললামও, কিন্তু তার আগে ভালো একটি কাগজে নকল ক'রে নিলাম, আর পরদিন তিনজনে বসিয়ে দিলাম যে যার নাম-সই, চোখ বুজে ছেড়ে দিলাম তাকে।

ঢাকা থেকে রাঁচি, রাঁচি থেকে ঢাকা। চার দিন, পাঁচ দিন...আচ্ছা, ছ-দিন। না, চিঠি নেই। সন্ধ্যায় কুয়াশা, একটু-একটু শীত ; চিঠি নেই। শিউলি ফুরিয়ে স্থলপদ্ম ফুটলো ; চিঠি নেই।

চিঠি এলো শেষ পর্যন্ত, হিতাংশুর নামে শীর্ণ একটি পোস্টকার্ড, লিখেছেন ওর মা।

কল্যাণীয়েষু হিতাংশু অসিত বিকাশকে বিজয়ার আশীর্বাদ জানিয়েছেন, তারপর খবর এই যে, তাঁদের রাঁচির মেয়াদ ফুরোলো, শিগগিরই ফিরবেন, ইতিমধ্যে হিতাংশু যদি তাঁদের ঘরগুলি খুলিয়ে ঝাঁটপাট করিয়ে রাখে তাহ'লে বড়ো ভালো হয়। চাবি তার বাবার কাছেই আছে। আর সব-শেষে লিখেছেন যে, তরুর শরীর এখন বেশ সেরেছে, মাঝে-মাঝে আমাদের কথা বলে।

মাঝে-মাঝে আমাদের কথা বলে! আর আমাদের চিঠি? পোস্টকার্ডটি তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া গেলো না যে, চিঠিটা পৌঁচেছিলো। কী হ'লো চিঠির? কিন্তু সে-কথা বেশিক্ষণ ভাববার সময় কই আমাদের, তক্ষুনি লেগে

গেলাম কাজে। একদিনের মধ্যে তারা-কুটিরের ধুলো-পড়া একতলাকে আমরা এমন ক'রে ফেললাম যে, মেঝেতে মুখ দেখা যায়। কয়েকদিন পরে আর-একটি পোস্টকার্ড: 'রবিবার ফিরছি, স্টেশনে এসো।' শুধু স্টেশনে? আমরা ছুটলাম—নারায়ণগঞ্জে।

আ, কী সুন্দর দেখলাম মোনা লিসাকে, কচি পাতার রঙের শাড়ি পরনে, লাল পাড়, লালচে মুখের রং, একটু মোটা হয়েছে, একটু যেন লম্বাও। পাছে কাছে দাঁড়ালে ধরা পড়ে যে সে আমাকে মাথায় ছাড়িয়ে গেছে, আমি একটু দূরে দাঁড়ালাম, হিতাংশু ছুটোছুটি ক'রে বরফ লেমনেড কিনতে লাগলো, আর অসিত কুলিদের ঠেলে দিয়ে বড়ো-বড়ো বাক্স-বিছানা হাঁই-হাঁই ক'রে তুলতে লাগলো গাড়িতে।

মাসিমা বললেন, 'তোমরা এ-গাড়িতেই এসো।'

'না না, সে কী কথা,—আমরা এই পাশের গাড়িতেই—'

'আরে, এসো না—' ব'লে দে-সাহেব গার্ডকে ডেকে আমাদের বাড়তি ভাড়াটা দিয়ে দিলেন।

নারানগঞ্জ থেকে ঢাকা: মনে হ'লো আমাদের জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়টি এতকাল এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্যই অপেক্ষা ক'রে ছিলো। ফার্স্ট ক্লাসের গদিকে অবজ্ঞা ক'রে আমরা বসলাম বাক্স-বিছানার উপর, তাতে একটা সুবিধে এই হ'লো যে, একসঙ্গে সকলকেই দেখতে পেলাম—দেখলাম, মোনা লিসা খুশি, ওর মা খুশি, বাবা খুশি, দেখতে-দেখতে আমরাও খুশিতে ভ'রে গেলাম; এতদিন যা বাধো-বাধো

ছিলো তা সহজ হ'লো, এতদিন যা ইচ্ছা ছিলো তা মূর্ত হ'লো—রীতিমতো কলরব করতে-করতে চললাম আমরা, এত বড়ো রেলগাড়িটা যেন আমাদের খুশির বেগেই চলেছে। মোনা 'লিসা নাম ধ'রে-ধ'রে ডাকতে লাগলো আমাদের—কত তার কথা, কত গল্প—আর গাড়ি যখন ঢাকা স্টেসনের কাছাকাছি, কোন-এক ঝরণার বর্ণনা করছে সে, হঠাৎ আমি ব'লে উঠলাম, 'আমাদের চিঠি পেয়েছিলে ?'

'তোমাদের চিঠি, না তোমার চিঠি ?'

আমি একটু লাল হ'য়ে বললাম, 'জবাব দাওনি যে ?'

'এতক্ষণ ধ'রে তো সেই জবাবই দিচ্ছি। বাড়ি গিয়ে আরো দেবো।'

মিথ্যে বলেনি মোনা লিসা। স্বর্গের দরজা হঠাৎ খুলে গেলো আমাদের। আমরা তিন জন আমরা চার জন হ'য়ে উঠলাম।

তারপর একদিন মাসিমা আমাদের ডেকে বললেন, 'একবার তোমরা তরুর জন্য খেটেছো, আর-একবার খাটতে হবে। পঁচিশে অঘ্রান ওর বিয়ে।'

পঁচিশে! আর দশ দিন পরে!

ছুটে গেলাম ওর কাছে, বললাম, 'মোনা লিসা, এ কী শুনছি!'

ভুরু একটু কুঁচকে বললো, 'কী ? কী বললে ?'

গোপন নামটা হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ায় আমি একটু থমকে

গেলাম, কিন্তু একবার যখন বেরিয়েই গেছে তখন আর ভয় কী। মরীয়া হ'লে মানুষের যে-সাহস হয়, সেই সাহসের বশে আমি সোজা তাকালাম ওর চোখের দিকে, চোখের ভিতরে—যা আগে আমি কখনো করিনি—বেগনি-বেগনি ব্রাউন রঙের ওর চোখ, এক ফোঁটা হিরের মতো চোখের মণি—তাকিয়ে থেকে আবার বললাম, 'মোনা লিসা।'

'মোনা লিসা! সে আবার কে?'

'মোনা লিসা তোমারই নাম', বললো অসিত। 'জানো না?'

'সে কী!'

হিতাংশু বললো, 'আর-কোনো নামে আমরা ভাবতেই পারি না তোমাকে।'

'মজা তো!' কৌতুকের রং লাগলো ওর মুখে, মিলিয়ে গেলো, পলকের জন্য ছায়া পড়লো সেখানে, যেন একটি ক্ষণিক বিষাদের মেঘ আস্তে ভেসে গেলো মুখের উপর। একটু তাকিয়ে রইলো, চোখের পাতা দুটি চোখের উপর নামলো একবার।

'কী শুনছি? মোনা লিসা, কী শুনছি?' আমাদের কথায় ঠাট্টার বুড়বুড়ি।

'কী, বলো তো?' ব'লে আঁচলে মুখ চেপে খিলখিল ক'রে হেসে পালিয়ে গেলো।

বর এলো বিয়ের দু-দিন আগে কলকাতা থেকে। ধবধবে ফর্সা, ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরনে, কাছে দাঁড়ালে সূক্ষ্ম একটি

সুগন্ধে মন যেন পাখি হ'য়ে উড়ে যায়। দেখে আমরা মুগ্ধ। হিতাংশু বার-বার বলতে লাগলো, 'হীরেনবাবু কী সুন্দর দেখতে!'

অসিত বললো, 'ধুতির পাড়টা!'

'পা দুটো!' ব'লে উঠলো হিতাংশু। 'অমন ফর্শা পা না হ'লে কি আর ও-রকম ধুতি মানায়!'

আমি ক্ষুণ্ণ ক'রে বললাম, 'কিন্তু বড্ড সুন্দর, একটু বোকা-বোকা।'

'কী! বোকা-বোকা!' অসিত চেঁচিয়ে উঠলো, কিন্তু চিৎকার বেরোলো না, কারণ লোকজন নিয়ে চ্যাঁচামেচি ক'রে বিয়ের অনেক আগেই সে গলা ভেঙে ব'সে আছে। রেগে-যাওয়া বেড়ালের মতো ফ্যাঁচফ্যাঁচ ক'রে বললো, 'এমন দেখেছো কখনো?'

'যোনা লিসার মতো তো নয়!' আমি আমার গোঁ ছাড়লাম না।

'একজন কি আর-একজনের মতো হয়! খুব মানিয়েছে দু-জনে। চমৎকার!' ব'লে অসিত লাফিয়ে সাইকেলে উঠে বোঁ ক'রে কোথায় চ'লে গেলো। বিয়ের সমস্ত ভারই তার উপর, তর্ক করার সময় কোথায়।

বিয়ের দিন শানাইয়ের শব্দে রাত থাকতেই আমার ঘুম ভাঙলো। চোখ মেলেই—মনে পড়লো সেই আর-একটি শেষরাত্রি, যখন মৃত্যুর হাত থেকে—তা-ই মনে হয়েছিলো এখন

—মোনা লিসাকে আমি ফিরিয়ে এনেছিলাম। সেদিন অন্ধকারের ভিতর থেকে একটু-একটু ক'রে আলোয় বেরিয়ে আসা দেখতে-দেখতে যে-আনন্দে আমি ভেসে গিয়েছিলাম, সেই আনন্দ ফিরে এলো আমার বুকে, গা কাঁটা দিয়ে উঠলো, শানাইয়ের সুরে চোখে জল এলো। আর শুয়ে থাকতে পারলাম না, তারা-ভরা আকাশের তলায় দাঁড়ালাম এসে, শুনতে পেলাম বিয়ে-বাড়ির শাঁখ, কাছে গেলাম, মনে হ'লো একবার যদি দেখতে পাই, এই ভোর হবার আগের মুহূর্তে, যখন আকাশ ঘোষণা করছে মধ্যরাত্রি আর হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে ভোর, এই অদ্ভুত অপার্থিব সময়ে একটু দেখতে পাই যদি। কিন্তু না—গায়ে-হলুদ হচ্ছে, কত-কত অচেনা মেয়ে ঘিরে আছে তাকে, কত কাজ, কত সাজ—এর মধ্যে আমি তো তাকে দেখতে পাবো না। বাইরে দাঁড়িয়ে ভিতরকার চলাফেরা কথাবার্তা শুনতে লাগলাম, আর সব ছাপিয়ে, সব ছাড়িয়ে শানাইয়ের সুর ঝরলো, আমার চোখের সামনে কাঁপতে-কাঁপতে শেষ তারা মিলিয়ে গেলো, ফুটে উঠলো গাছপালার চেহারা, মাটির অবয়ব, পৃথিবীতে আর-একবার ভোর হ'লো।

সেদিন অসিতের গলা একেবারেই ভেঙে গিয়ে নববধূর মতো ফিশফিশে হ'লো ; এত ব্যস্ত সে, আমাকেই ভালো ক'রে চেনে না। হিতাংশুও ব্যস্ত, ব্যস্ত এবং একটু গর্বিত, কেননা বর সদলে বাসা নিয়েছেন তাদেরই বাড়ির দুটো ঘরে, একতলা-

দোতলায় দূতের কাজ করতে-করতে সে হ্যাণ্ডেল ক্ষইয়ে ফেললো। আমি সারাদিন ধ'রে একবার হিতাংশুকে, একবার অসিতকে সাহায্যের চেষ্টা করলাম, কিন্তু আমার নিজের মনে হ'লো না বিশেষ কোনো কাজে লাগছি, আর শেষ পর্যন্ত বিয়ের পিঁড়িতে বসিয়ে কনেকে সাত-পাক ঘোরাবার সময় যখন এলো, তখনও আমি এগিয়ে গেলাম, কিন্তু আমাকে ঠেলে দিয়ে অসিত আর হিতাংশুই পিঁড়ি তুললো, দু-হাত দিয়ে দু-জনের গলা জড়িয়ে ধ'রে ও সাত পাক ঘুরলো, আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলাম।

বিয়ের পরদিন থেকেই আমরা তিনজন হীরেনবাবুর চাকর ব'নে গেলাম। তাঁর মতো সুন্দর কেউ না, তাঁর মতো বিদ্যাবুদ্ধি কারো নেই, তাঁর মতো ঠাট্টা কেউ করতে পারে না। অন্য পুরুষদের বাঁদর মনে হ'লো তুলনায়—আমারও আর মনে হ'লো না যে তাঁর মুখের ভাবটা বোকা-বোকা। এমনকি আমি তাঁর নকল করাও ধরলাম, চেষ্টা করলাম তাঁর মতো ক'রে বসতে, দাঁড়াতে, হাঁটতে, হাসতে, কথা বলতে; ওরা দু-জনও তা-ই করলো, আবার তা দেখে হাসি পেলো আমার, হয়তো প্রত্যেকেই আমরা অন্য দু-জনের চেষ্টা দেখে হেসেছি মনে-মনে, যদিও মুখে কেউ কিছু বলিনি।

একদিন দুপুরবেলা হীরেনবাবুর কাছে খুব একটা মজার গল্প শুনছি, তিনি একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, 'ছাখো তো ভাই, তরু গেলো কোথায়?'

'ডেকে আনবো ?' ব'লে আমি ছুটে বেরিয়ে গেলাম।

দক্ষিণের বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়ে ব'সে মোনা লিসা চুল আঁচড়াচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম, দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভুলে গেলাম, হঠাৎ কেমন নতুন লাগলো তাকে, একটু অন্যরকম, সিঁথিতে সিঁদুর, পরনে কড়কড়ে নতুন শাড়ি, কানে হাতে গলায় চিকচিকে গয়না, আর কেমন-একটা গন্ধ দিচ্ছে গা থেকে —হীরেনবাবুর সেন্টের গন্ধ না, নতুন ফার্নিচারের মদ-মদ গন্ধ না, চুলের তেল কি মুখের পাউডারেরও না—আমার মনে হ'লো এই সমস্ত গন্ধের যেটা আত্মা, সেটাই ভর করেছে মোনা লিসার শরীরে। জোরে নিশ্বাস নিলাম কয়েকবার, মাথাটা যেন ঝিম ক'রে উঠলো।

চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, 'কী ?'

'কিছু না—' সঙ্গে-সঙ্গে কাজের কথাটা মনে পড়লো, 'হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

আমার শেষ কথাটা যেন শুনতেই পেলো না মোনা লিসা, নিশ্চিন্তভাবে চুলই আঁচড়াতে লাগলো।

'শুনছো না কথা! হীরেনবাবু ডাকছেন তোমাকে।'

'ডাকছেন তো হয়েছে কী! উনি ডাকলেই যেতে হবে ?'

'বাঃ— !'

চিরুনি থামিয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আর কী! শিগগিরই তো চ'লে যাবো।'

আমি বললাম, 'কত ভালো লাগবে তোমার কলকাতায়—ঢাকা কি একটা জায়গা!'

'তোমরা আমাকে মনে রাখবে, বিকাশ?'

আমি ব্যস্ত হ'য়ে বললাম, 'আর কথা না! চলো এখন।'

'দেখছো না চুল আঁচড়াচ্ছি! বলো গিয়ে এখন যেতে পারবো না।'

কথা শুনে প্রায় ভড়কে গিয়েছিলাম, কিন্তু একটু পরেই মোনা লিসা উঠলো, তার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও এলাম ঘরে। বললাম, 'তারপর কী হ'লো, হীরেনবাবু?'

কিন্তু হীরেনবাবুর গল্প বলবার উৎসাহ দেখি মীইয়ে গেছে। জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, আর মোনা লিসা চেয়ারে ব'সে টেবিলের কাপড় খুঁটতে লাগলো।

আমি পীড়াপীড়ি করলাম, 'বলুন না তারপর!'

'এখন থাক।'

আমি খাটে ব'সে একটা ইংরেজি বইয়ের পাতা উল্টিয়ে বললাম, 'এটা পড়েছি। ভারি মজার বই!'

হীরেনবাবু হঠাৎ শোয়া থেকে উঠে ব'সে বললেন, 'এ-বইটাও ভারি মজার। এক কাজ করো তুমি—ওটা বাড়ি নিয়ে গিয়ে প'ড়ে ফ্যালো, আমি চট ক'রে একটু ঘুমিয়ে নিই। কেমন?' বলতে-বলতে তিনি একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

আমি আর কথা না-ব'লে আস্তে বেরিয়ে এলাম; পিঠ

দিয়ে অনুভব করলাম ঘরের দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলো। বাড়ি গেলাম না; বারান্দায় যেখানে ও ব'সে ছিলো, ঠিক সেখানটায় ব'সে পড়লাম। ওর চুলের গন্ধমাখা চিরুনিটা সেখানেই প'ড়ে ছিলো, হাতে তুলে নিয়ে দাঁতগুলির উপর আঙুল চালাতে লাগলাম বার-বার।

আরো একদিন, আরো একদিন। যাবার দিন এলো, পিছোলো, আর-একটা, একটা দিন। তারপর ওরা চ'লে গেলো।

চিঠি এলো এবার, তিনজনের কাছে একখানা চিঠি, মোটা নীল খামে, আমার নামে। তিনজনের হ'য়ে জবাব লিখলাম আমি, একটু লম্বাই হ'লো, সেইসঙ্গে একটা কবিতাও লিখে ফেললাম, সেটা অবশ্য পাঠালাম না। চিঠিপত্র বন্ধ হ'লো শিগগিরই, তারপর শুধুই কবিতা লিখতে লাগলাম।

মাসিমার কাছে খবর পাই সবই। ভালো আছে ওরা, খুব ভালো আছে। হীরেন গাড়ি কিনেছে, সেদিন ওরা আসানসোল বেড়িয়ে এলো। কলকাতায় কথা-বলা সিনেমা দেখাচ্ছে, টোম্যাটোর সের এক পয়সা, তবে শীত ক'মে গেছে হঠাৎ, অসুখ-বিসুখ দেখা না দেয়। আর-একটু গরম পড়লেই ওরা চ'লে যাবে দারজিলিং।

মনে-মনে না-দেখা দারজিলিংএর ছবি দেখতে লাগলাম, কিন্তু সে-ছবি মুছে দিয়ে মাসিমা একদিন বললেন, 'ওরা তো আসছে।'

আসছে! এখানে! ঢাকায়! কেন, দারজিলিঙের কী হ'লো?

আমাদের নীরব প্রশ্নের উত্তরে মাসিমা বললেন, 'শরীরটা খারাপ হয়েছে ওর, আমার কাছেই থাকবে এখন।'

'আবার অসুখ?' চমকে উঠলাম তিনজনে।

'না, অসুখ ঠিক না, শরীরটা ভাল নেই আরকি,' মাসিমা মৃদু হাসলেন।

খুব খারাপ লাগলো। খারাপ লাগলো মাসিমার কথা শুনে, হাসি দেখে। শরীর ভালো না, অথচ অসুখ নয়—এ আবার কী-রকম কথা? আর মাসিমা কেমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ, যেন খুশিই হয়েছেন খবর পেয়ে। রীতিমতো রাগ হ'লো মনে-মনে।

ওরা পৌঁছবার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আমরা তিন মূর্তি গিয়ে হাজির। মোনা লিসা সোফায় ব'সে আছে একটু এলিয়ে, হাতে সিগারেটের টিন। চকিতে আমরা তিনজনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম—হীরেনবাবু কি সিগারেট ধরালেন ওকে?

আমাদের দেখে ফিকে একটু হাসলো। কথা বললো না।

'কেমন আছো, মোনা লিসা?' আমরা চেষ্টা করলাম ফূর্তির সুর লাগাতে।

সিগারেটের টিনটি মুখের কাছে এনে তার সঙ্গে মুখ ঠেকিয়ে ডালা বন্ধ ক'রে বললো, 'এই—'

'তোমার নাকি অসুখ?'

সে-কথায় কোনো জবাব না দিয়ে বললো, 'তোমাদের কী

খবর ?' তারপর আস্তে-আস্তে এটা-ওটা গল্প করতে লাগলো, আর সিগারেটের টিনটি মুখে তুলতে লাগলো ঘন-ঘন।

হীরেনবাবু ঘরে এসে ব্যগ্রভাবে বললেন, 'তরু, এখন কেমন আছো ?'

ক্লান্ত চোখ তুলে বললো, 'ভালো।'

'তুমি বরং একটু শোও।'

'না, এই বেশ আছি।'

'এই যে তোমরা এসেছো দেখছি। তরু তো এদিকে—' হঠাৎ থেমে গেলেন হীরেনবাবু।

'হয়েছে কী ওর ?'

'হয়নি কিছু, তবে...'

তবে কী ? ওর কি এমন কোনো সাংঘাতিক অসুখ করেছে যা কারো কাছে বলাও যায় না ? আর ও যেন কেমন হ'য়ে গেছে, হাসি পেলে ভালো ক'রে হাসেও না। মায়েদের মুখে শুনেছি যে, বিয়ের পরে মেয়েদের শরীর আরো ভালো হয়, কিন্তু আমাদের সোনা দিদার এই নাকি হ'লো!

ছোটো একটি প্লেট হাতে ক'রে মাসিমা এসে বললেন, 'এটা একটু মুখে দিয়ে ছাখ তো।'

'কী, মা ?'

'ছাখ না—' ব'লে তিনিই আঙুল দিয়ে মুখে গুঁজে দিলেন।

'না, না, আর না!,' সোনা দিদার মুখে কষ্টের রেখা ফুটে উঠলো, গলার কাছটায় হাত রেখে মুখ নিচু করলো সে।

বেরিয়ে এসে খানিকক্ষণ নিঃশব্দে হাঁটলাম আমরা, মন খুবই বিষণ্ণ। হঠাৎ অসিত বললো, 'ও বার-বার থুতু ফেলছিলো সিগারেটের টিনে।'

'যাঃ!' আমি আঁৎকে উঠলাম।

'সত্যি। আমি দেখলাম!'

আমি বললাম, 'তাহ'লে এটাই বোধহয় ওর অসুখ।'

'অসুখ না,' অসিত গম্ভীরভাবে বললো, 'ওর ছেলে হবে।'

শুনে হিতাংশুটা খুকখুক ক'রে হেসে উঠলো। 'হাসছো কেন?' আমি চ'টে উঠে বললাম, 'হাসবার কী আছে এতে?'

অসিত বললো, 'ঐ জন্যই তো কাঁচা আম-মাখা এনে দিলেন মাসিমা। এ-রকম হ'লে টক খেতে ভালো লাগে।'

'তুমি সবই জানো!' রাগে আমি গ'র্জে উঠলাম।

'হ'লো কী তোমার?' অসিত, যেন সকৌতুকে, আমার দিকে তাকালো।

'যা-ওঃ! কিছু ভালো লাগছে না আমার, আমি বাড়ি যাই।' ওদের ত্যাগ ক'রে একা ফিরে এলাম বাড়িতে, বেলাশেষের আলোয় খাতা খুলে কবিতা লিখতে ব'সে গেলাম।

হীরেনবাবু ফিরে গেলেন দু-দিন পরেই। দুপুরবেলা গাড়ি। ঘোড়ার গাড়িতে মাল তোলা হ'লো: হীরেনবাবু উঠতে গিয়ে থমকালেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'কিছু ফেলে এসেছেন, নিয়ে আসবো?'

'না, না, আমিই যাচ্ছি।'

তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে গেলেন তিনি, ফিরে এসে কোনোদিকে না-তাকিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন। চাবুকের শব্দ হ'লো। অসিত গলা বাড়িয়ে বললো, ·'কবে আসবেন আবার?'

'আসবো···তোমরা দেখো ওকে,' ব'লে হীরেনবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমার মনটা হু-হু ক'রে উঠলো।

কী স্তব্ধ সেই দুপুরবেলা, কেমন ছবির মতো সুন্দর, সেই উনিশ শো-আটাশ সনে, পুরানা পল্টনের ফাল্গুন মাসে। ঘোড়ার গাড়িটা ছোটো হ'তে-হ'তে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হ'লো, আমরা ভিতরে এলাম। বালিশে মুখ গুঁজে মোনা লিসা ফুলে-ফুলে কাঁদছে।

'মোনা লিসা!'

'শোনো, কথা শোনো।'

'হীরেনবাবু আবার তো আসবেন—'

'এর পর ওঁকে আর যেতেই দেবো না আমরা!'

'আর না—আর কেঁদো না, মোনা লিসা।'

থামলো না কান্না। আমি মেঝেতে হাঁটু ভেঙে ওর কাছে ব'সে পড়লাম, ওর মাথায় হাত রেখে বলতে লাগলাম, 'চুপ করো, চুপ করো, মোনা লিসা।' বলতে-বলতে হঠাৎ গলা ভেঙে আমার চোখেও জল এলো।

একটু পরে মোনা লিসা আমাকে ঠেলা দিয়ে বললো, 'এই—

কাঁদছো কেন? বোকা!' চুপ ধ'রে ঝাঁকানি দিয়ে আবার বললো, 'পুরুষমানুষ—কাঁদতে লজ্জা করে না! থামো এক্ষুনি!'

আমি মুখ তুললাম। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সুখে আমার বুক কেঁপে উঠলো, তারপর সারাদিন ধ'রে একটু-একটু কাঁপলো, রাত্রে ঘুমের মধ্যেও ভুলতে পারলাম না।

আমরা তিনজন ওকে ঘিরে রইলাম। ও যাতে ভালো থাকে, খুশি থাকে, কখনো মন-খারাপ না করে। হঠাৎ এক-একটা অদ্ভুত জিনিস ওর খেতে ইচ্ছে করে, অসিত শহর ঢুঁড়ে তা জোগাড় ক'রে আনে। দেখেই ওর ইচ্ছে চ'লে যাবে, জানা কথাই, কিন্তু আবার নতুন ইচ্ছা কবে হবে সেই আশায় থাকি আমরা। আর যদি কখনো একটু খায়, খেয়ে ভালো বলে, তাহ'লে তো কথাই নেই—খুশিতে আমরা হাবুডুবু।

হীরেনবাবুর চিঠি আসতে দেরি হ'লেই আমরা বলি, উনি হঠাৎ এসে অবাক ক'রে দেবেন ব'লেই চিঠি লিখছেন না। কথাটা ঠিক নয় জেনেও প্রতি বারই মোনা লিসার মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। আমরা চুপ ক'রে উপভোগ করি।

হীরেনবাবু এলেন তিনমাস পরে। ততদিনে ওর শরীর অনেকটা সেরেছে; খায়, বেড়ায়, ফেরিওলা ডেকে কাপড় কেনে, চেহারাও ভারি-ভারি হয়েছে। এবার দিন-দশেক থাকলেন হীরেনবাবু, তারপর পূজোর ছুটিতে এসে এক মাস কাটালেন।

ততদিনে ওর শরীর আবার খারাপ হচ্ছে। ডাক্তার

আসছেন ঘন-ঘন, ওষুধ দিচ্ছেন, কিন্তু যা শুনি তাতে মনে হয়, কিছুই হচ্ছে না। কী কষ্ট জানি না, বুঝি না, শুধু চোখে দেখতে পাই—চোখে কালি পড়েছে, দুটো কথা বললেই হাঁপিয়ে পড়ে, মুখটা এক-এক সময় নীল হ'য়ে থাকে। আমরা কাছে-কাছে ঘুরঘুর করি, শুয়ে থাকলে হাওয়া করি হাত-পাখায়, কখনো একটু ভালো দেখলে হাসিঠাট্টায় ভোলাতে চাই,—কিছুই পারি না।

একদিন আমি বললাম, 'বাবর নিয়েছিলেন হুমায়ুনের অসুখ, ও-রকম নিতে পারলে বেশ হ'তো।'

অসিত হো-হো ক'রে হেসে উঠলো।—'আর যা-ই পারো, ওর এ-অসুখটা তুমি নিতে পারবে না!'

লাল হ'য়ে বললাম, 'অসুখ না, অসুখের কষ্ট।'

হিতাংশু বললো, 'কী কষ্ট, সত্যি। সারা রাত নাকি পায়চারি করে—ঘুমোতে পা[illegible] না। শুতেও নাকি কষ্ট হয়।'

অসিত বললো, 'তা তো হবেই। দেখতে কী রকম হয়েছে, দেখেছো!'

আমি প্রতিবাদ করলাম, 'কী-আবার হবে। সুন্দর হয়েছে, খুব সুন্দর।'

'যত সুন্দরই হোক, এই শেষের সময়টা—'

আমি গলা চড়িয়ে বললাম, 'এই সময়টাই তো সবচেয়ে সুন্দর!'

আমার তীব্রতা ওদের বোধহয় একটু অপ্রস্তুত ক'রে দিলো ; আর-কিছু বললো না।

যত দিন কাটলো, ততই আমি ওকে আরো সুন্দর দেখলাম, ওর সারা শরীর এক আশ্চর্য সৌন্দর্যে ভ'রে উঠলো আমার চোখে। একদিন ওকে না-ব'লে পারলাম না সে-কথা। গেলো-বছর যেদিন ওরা রাঁচি থেকে ফিরেছিলো, যেদিন রেলগাড়ির একটি ছোটো কামরায় সমস্ত স্বর্গ ধ'রে গিয়েছিলো, ঠিক সেইরকম একটি প্রথম শীতের রোদ্দুর-ঢালা দিনে ও হঠাৎ বললো, 'আমি দেখছি, বিকাশ, আজকাল তুমি বড্ড তাকিয়ে থাকো আমার দিকে।'

'তুমি আজকাল খুব সুন্দর হয়েছো, তাই।'

'আগে বুঝি সুন্দর ছিলাম না ?'

'এখন আরো বেশি হয়েছো।'

মোনা লিসা ভুরু কুঁচকে বাইরের দিকে তাকালো। বললো, 'সত্যি তোমরা ভালোবাসো আমাকে। কিন্তু ও-রকম ক'রে আর তাকিয়ো না, ভারি অসুবিধে লাগে আমার।...উশ, বাইরে কী রোদ !'

আমি উঠে জানলাটা ভেজিয়ে দিলাম।

'একটু ঘুমিয়ে নিই, কেমন ?'

পায়ের কাছে একখানা চাদর ছিলো ভাঁজ-করা, খুলে পায়ের উপর ছড়িয়ে দিতে-দিতে বললাম, 'আজকাল তুমি বেশ ভালোই আছো, না ?'

'আমি তো ভালোই আছি।'

ওর মুখে দেখলাম সাহসের সঙ্গে আশা, আশার সঙ্গে ভয়, ভয়ের সঙ্গে ধৈর্য। পায়ের পাতা থেকে চাদর সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'হীরেনবাবু চ'লে গেলেন কেন?'

'বা রে! ওঁর বুঝি কাজকর্ম নেই?'

'কবে আসবেন আবার?'

'আসবেন সময়মতো।'

'কী দরকার ছিলো থাবার—আমার মোটেও ভালো লাগে না।'

'হয়েছে, হয়েছে—আর পাকামি করতে হবে না,' ব'লে পাশ ফিরে চোখ বুজলো। বোজা-চোখেই বললো,—'আমি কিন্তু ঘুমোলাম,' এবং সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লো। আহা, রাত্তিরে ঘুমোতে পারে না, কত ক্লান্তি ওর শরীরে। মনে-মনে বললাম—কার কাছে জানি না—ওর ভালো হোক, ওর ভালো হোক।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হ'লো, ও হয়তো এতক্ষণে ছটফট করছে কষ্টে, উঠে পায়চারি করছে ঘরের মধ্যে, আর বাইরে শেয়াল-ডাকা অন্ধকার আর আকাশে এখনো সাত-আট ঘণ্টা রাত্রি। কেন আমি কিছু করতে পারি না, কেন এক্ষুনি যেতে পারি না ওর কাছে, কোনো অলৌকিক উপায়ে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না ওকে? চোখের উপর কষ্ট দেখতে হবে, কিছু করা যাবে না, এই কি মানুষের ভাগ্য? সত্যি কি আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনো উপায় নেই? ভাবতে-

ভাবতে ঘুম ছুটলো চোখের, কবিতার লাইন মনে এলো, উঠে বসতেই চোখে পড়লো বাইরে কৃষ্ণপক্ষের জ্যোছনা; আমার জানলা দিয়ে আবছা দেখা যাচ্ছে তারা-কুটির, স্বপ্নের মতো, স্মৃতির মতো। বেশিক্ষণ তাকালাম না, লণ্ঠন জ্বেলে কেরোসিনের গন্ধে আর মশার কামড়ে ব'সে-ব'সে কবিতা বানাতে লাগলাম।

রোজ হ'তে লাগলো এ-রকম; আমার রাত্রি থেকে ঘুম চ'লে গেলো। আমিও জেগে আছি ওর সঙ্গে-সঙ্গে; আমি ওর প্রহরী, সকল দুঃখ থেকে আমি বাঁচাবো ওকে—এ-কথা ভাবতে-ভাবতে দেবতা মনে হ'লো নিজেকে, কবিতায় এমন সুন্দর-সুন্দর সব কথা এলো যে নিজেই অবাক হলাম।

এমনি এক রাত্রে—রাত প্রায় দুটো তখন—লিখতে-লিখতে হঠাৎ আমার হাত কেঁপে একটা অক্ষর বেঁকে গেলো। শুনলাম, বাইরে কে ডাকছে আমাকে, 'বিকাশ, বিকা—শ!' একটু অপেক্ষা করলাম, আবার শুনলাম চাপা-গলায় ডাক। আস্তে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখি, ওরা দু-জন ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে।

সে-রাত্রে তখনো চাঁদ ওঠেনি, সারা রাত্রেও বোধহয় ওঠেনি, অমাবস্যার কাছাকাছি রাত। আকাশ ছিলো তারায় ঝকঝকে, তারই ধুলোর মতো আলোয় আমরা তিনজন দাঁড়ালাম—শীতের রাত্রে, মাঠের মধ্যে, ঢিপঢিপ বুকে।

'কী, অসিত? হিতাংশু, কী-খবর?'

'আরম্ভ হয়েছে বোধহয়,' কথা বললো হিতাংশু।

'আরম্ভ হয়েছে ?'

'একতলায় শুনলাম চলাফেরা কথাবার্তা, আর চাপা একটা গোঙানি। ঘুমের মধ্যেই যেন শুনলাম, তারপর আর বিছানায় থাকতে পারলাম না। অসিতকে ডেকে তুলে তোমার কাছে এলাম। তুমি কি জেগেই ছিলে ?'

আমি কথা বললাম না, তারার আলোয় দেখলাম হিতাংশুর মুখ শাদা, আর অসিত মুখ ফিরিয়ে দূরের দিকে তাকিয়ে আছে। এ-ক'দিনে আমরাও যেন বদলে গিয়েছিলাম, হাসি ঠাট্টা আড্ডা ক'মে গিয়েছিলো, বেশি কথা বলতাম না, আর এতদিন ধ'রে যে-মানুষকে নিয়ে লক্ষ কথা আমরা বলেছি, তার বিষয়েই একেবারে আমরা চুপ। রুদ্ধশ্বাস আমরা, প্রতীক্ষায় রুদ্ধশ্বাস।

আমরা বুঝলাম না যে আমরা কাঁপছি, জানলাম না যে আমরা হাঁটছি, কখন বাগানের ছোটো গেট খুলে কখন এসে সিঁড়ির তলায় দাঁড়ালাম। নিশ্চয়ই আমরা কোনো শব্দ করিনি, কোনো কথাও বলিনি, কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই দে-সাহেব টর্চ হাতে বেরিয়ে এলেন, যেন আমাদেরই অপেক্ষা করছিলেন এতক্ষণ। নিচু-গলায় বললেন, 'অসিত, একবার যাও তো সাইকেলটা নিয়ে ডক্টর মুখার্জির কাছে—একেবারে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসবে তাঁকে।'

অন্ধকারে হাওয়ার মতো মিলিয়ে গেলো অসিত। আমি

আর হিতাংশু সিঁড়ির উপরেই ব'সে পড়লাম। একটা কান্না, চাপা, একটানা, আমাদের পিঠ ফুঁড়ে বুকের মধ্যে ঢুকলো, তার যেন আওয়াজ নেই, শুধু কষ্ট আছে, যেন পৃথিবীর প্রাণে আঘাত দিয়েছে কেউ, পৃথিবীর বুক থেকে এই কান্না উঠছে, তাই কোনোদিনই থামবে না।

ওকে চোখে দেখতে পারি না আমরা, দূর থেকেও না; ওর ঘরে যেতে পারি না আমরা, ঘরের কাছেও না; শুধু বাইরে ব'সে থাকতে পারি, শীতে, অন্ধকারে, না-জেগে, না-ঘুমিয়ে, আকাশের সামনে, অদৃষ্টের মুখোমুখি।

ডাক্তারের আনাগোনা শুরু হ'লো, চললো বাকি রাত ভ'রে, চললো তার পরের দিন। সকাল হ'তেই চড়া মাশুলে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলাম হীরেনবাবুকে—মনে-মনে ভাবলাম, টেলিগ্রাম যত দ্রুতই ছুটে যাক, আর তার চেয়েও দ্রুতবেগে ছুটে আসুক হীরেনবাবুর মন, কাল বিকেলের আগে তিনি পৌঁছতে পারবেন না কিছুতেই—কী অসহায় মানুষ, কী নিরুপায়! ডাক্তার, নর্স, ধাত্রী; ওষুধ, ইনজেকশন, প্রার্থনা—তবু অসহায়, তবু মানুষ অসহায়;—কী হচ্ছে, কী হ'লো, কী হবে, এ-সব প্রশ্নের উত্তর নেই কারো চোখে, ডাক্তারের মুখ পাথরের মতো, ওর মা-বাবার মুখে সংক্ষিপ্ত ফরমাশ ছাড়া কথা নেই, মাসিমা আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি পর্যন্ত করেন না, আর, দে-সাহেবের পরিপাটি চেহারার তলায় একজন কুঁকড়োনো বুড়ো-মানুষ যে লুকিয়ে আছে এতদিন তা

কে জানতো ! কে জানতো আকাশের নীল ভাঁড়ে এই কান্না আছে লুকিয়ে ! আর, আমাদের কি আর-কিছু করবার নেই, কান পেতে এই কান্না শোনা ছাড়া ?

দুপুরের আগেই বিকেল হ'য়ে গেলো সেদিন, বিকেলের আগেই অন্ধকার। তারপর, রাত যখন একটু ভারি, হঠাৎ যেন পৃথিবীর পেট চিরে চিৎকার উঠলো ; উঠলো, পড়লো, আবার উঠলো আকাশের দিকে ; আকাশ চুপ, তারাদের নড়চড় হ'লো না ; আবার, প্রতিমার সামনে যেন ছাগশিশুর আর্তরব, কিন্তু দু-বার চার বার দশ বার নয়, চললো ঘন্টার পর ঘণ্টা, বিরামহীন। আমরা ছুটে গেলাম বাইরে, মাঠের মধ্যে যত দূরে যাই সে-শব্দ আমাদের পিছনে ছোটে, মাতা পৃথিবীর চিৎকার এটা, এ থেকে কোথায় নিস্তার ?

ফিরে গেলাম। ভিতরে আলো, ব্যস্ততার ঢেউ, ফাঁকে-ফাঁকে ডাক্তারের ব্যস্ত গলা, আর বাইরে অফুরন্ত তারা, অসীম অন্ধকার, অপরূপ রাত্রি। কিন্তু, পৃথিবীর কান্না তো থামে না।

যে-তারা ছিলো মাথার উপর, নেমে এলো পশ্চিমে ; যে-তারা ছিলো চোখের বাইরে, উঠে এলো দিগন্তের উপরে ; পূবের কালো ফিকে হ'লো, অনেকগুলি ছোটো তারা মুছে গিয়ে একটি মস্ত সবুজ একলা তারা জ্বলজ্বল করতে লাগলো সেইখানে। এই সেই অপার্থিব মুহূর্ত, অলৌকিক নয়, যখন আমি জেগে উঠে বাইরে এসেছিলাম ওর বিয়ের দিনে, যখন

আমি ওকে পেয়েছিলাম মৃত্যুর হাত থেকে. অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে একটি মাত্র আলো-জ্বলা নৌকোয়। অন্তত এক মুহূর্তের জন্য সেদিন সে আমার হয়েছিলো, আজ কি আবার এলো সেই মুহূর্ত ?

অসিত ফিশফিশ ক'রে বললো, 'কী, হ'লো ?'

হিতাংশু বললো, 'কই, না।'

'সব যেন চুপ ?'

'তাই তো !'

'যাবো একবার ?' অসিত উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু গেলো না। অনেক, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলাম আমরা, কিন্তু আর-কোনো শব্দ নেই, সব স্তব্ধ, তারপর হঠাৎ দেখি দে-সাহেব আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। ভোরের প্রথম ছাইরঙা আলোয় দেখলাম, তাঁর ঠোঁট ন'ড়ে উঠলো, এমন স্থির হ'য়ে আমরা তাকিয়ে ছিলাম, আর এমন স্তব্ধ চারদিক যে, তাঁর কথাটা আমরা কানে না-শুনে যেন চোখ দিয়ে দেখলাম :

'এসো তোমরা, ওকে দেখবে।'

অসিত আর হিতাংশুই সব করলো, রাশি-রাশি ফুল নিয়ে এলো কোথা থেকে, আরো কত কিছু, বেলা দুটো পর্যন্ত শুধু সাজালো, তারপর নিয়ে যাবার সময় সকলের আগে থাকলো ওরা দু-জন। আরো অনেকে এলো কাঁধ দিতে, শুধু আমি বেঁটে ব'লে বাদ পড়লাম, পিছন-পিছন হেঁটে চললাম একলা। ঠিক একাও নয়, কারণ, ততক্ষণে হীরেনবাবুও এসে পৌঁচেছেন,

শাড়ির কাপড়ে, জুতো-ছাড়া পায়ে তিনিও চললেন আমার পাশে-পাশে।

হীরেনবাবু পরের বছর আবার বিয়ে করলেন, সে-সাহেব চ'লে গেলেন বদলি হ'য়ে। কিছুদিন পর্যন্ত লোকেরা বলাবলি করলো ওঁদের কথা, তারপর তারা-কুটিরের একতলায় অন্য ভাড়াটে এলো, পুরানা পল্টনে আরো অনেক বাড়ি উঠলো, ইলেকট্রিক আলো জ্বললো। অসিত স্কুল থেকে বেরিয়ে চাকরি নিলো তিনসুকিয়ায়, ছ-মাসের মধ্যে কী-একটা আসামি-অসুখ ক'রে হঠাৎ ম'রে গেলো। হিতাংশু বি. এস.-সি. পাশ ক'রে জর্মানিতে পড়তে গেলো, আর ফিরলো না, সেখানকারই একটি মেয়ে বিয়ে ক'রে সংসার পাতলো, এখন এই যুদ্ধের পরে কোথায় আছে, কেমন আছে কে জানে! আর আমি—আমি এখনো আছি, ঢাকায় নয়, পুরানা পল্টনে নয়, উনিশ শো সাতাশে কি আটাশে আর নয়; সে-সব আজ মনে হয় স্বপ্নের মতো, কাজের ফাঁকে-ফাঁকে একটু স্বপ্ন, ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে একটু গন্ধ—সেই মেঘে-ঢাকা সকাল, মেঘ-ডাকা দুপুর, সেই বৃষ্টি, সেই রাত্রি, সেই—সেই তুমি! মোনা লিসা, আমি ছাড়া আর কে তোমাকে মনে রেখেছে!

*

* *

সাহিত্যিকের শেষ কথাগুলি ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় যেন খানিকক্ষণ ভেসে থাকলো, তাঁর শেষ উত্তরহীন প্রশ্নের সামনে

একলা তিনি চুপ ক'রে ব'সে থাকলেন। এখন আর অস্থিরতার কোনো লক্ষণ নেই তাঁর মধ্যে, সোজা ব'সে আছেন হাত দুটি কোলের উপর স্তব্ধ ক'রে, সোজা তাকিয়ে আছেন—কোন দিকে, কিসের দিকে নিজেও তিনি জানেন না। এতক্ষণ আপন মনেই ব'লে যাচ্ছিলেন—যেন আওয়াজ ক'রে ভাবছিলেন মনে-মনে, কোথায় আছেন, অন্য কেউ তাঁর কাছাকাছি আছে কিনা, ... যেন ভুলেই গিয়েছিলেন। কথার শেষেও তাঁর কথা ... ফুরোলো না, নিজের কথাই ফিরে-ফিরে শুনতে লাগ... তারপর জলের গায়ে ঢিল-ছোঁড়া ঢেউয়ের মতো তাঁর কথ... রেশও আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো। তখন তাকিয়ে দেখলে... চারদিকে, দেখলেন ইলেকট্রিকের কেমন-যেন অস্বাভাবিক আলোয় টুণ্ডলা স্টেশনের ওয়েটিংরুম, সামনের টেবিলে ছাইদানে জ'মে-ওঠা সিগারেটের ছাই, কফির পেয়ালায় সিগারেটের টুকরো;—তাঁর তিন সহযাত্রীকেও দেখলেন। তিন জনেই ঘুমুচ্ছেন। ইজি-চেয়ারে কনট্র্যাক্টর, ওভারকোটের উপরে কম্বল মুড়ি দিয়েছেন, পুরোনো ঘড়ির ঘণ্টা বাজার মতো ঘড়ঘড় ক'রে নাক ডাকছে। ডাক্তার ঘুমুচ্ছেন টেবিলে হাতের ভাঁজে মাথা গুঁজে, কিন্তু, দিল্লিওলা সোজা ব'সে-ব'সেই, ... মাথাটি একটু হেলিয়ে, ঘুমেও তাঁর গাম্ভীর্যের খেলাপ হয়নি। এই ঘুমন্ত মানুষদের নিশ্বাসে, আর এতক্ষণের সিগারেটের ধোঁয়ায়, ঘরের হাওয়া কেমন ভারি, ঘন;—বিকাশবা... অর্থাৎ সাহিত্যিকটি, নিজেও যদিও বড্ড সিগারেট খান, ...

কটু গন্ধটা তখন তাঁর ভালো লাগলো না। আস্তে উঠে
হঁয়ে এলেন তিনি—কনকনে ঠাণ্ডায় প্রথম কেঁপে একবার
ঠলেন, তারপরেই, যেন তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে, খুব
পাছেই কোথায় জোর গলায় মোরগ ডেকে উঠলো—দিনের
প্রলার প্রতিশ্রুতি।—ভোর!

ত্যিকের সারা শরীরে আনন্দের রোমাঞ্চ জাগলো—এ
এ কত কাল পর তিনি জানলেন। আবার সেই মহান মুহূর্ত
আকাশে রাত্রি কিন্তু হাওয়ায় ভোর—সেই আশ্চর্য মুহূর্ত,
কল্পনা করাও যায় না যে, এই অন্ধকার আর আকাশভরা
য় ছড়ানো রাত্রির প্রকাণ্ড ভার কত মন্ত্র লঘু-হাতে সরিয়ে
য়, কত শীঘ্র উজ্জ্বল ঊষাদেবী পৃথিবীর দরজায় এসে
ড়াবেন। স্বচ্ছ হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে-নিতে সাহিত্যিকের
ন হ'লো এ যেন ঠিক তেমনি একটি ভোর, যেমন
নি দু-একবার পেয়েছিলেন তাঁর পুরানা পল্টনে. উনিশ-শো
তাপে। কী আশ্চর্য যে, পৃথিবী একটুও বুড়ো হয় না,
ঠিক তেমনি থাকে, শুধু আমরাই শুকিয়ে-শুকিয়ে ঝ'রে
ই

টফর্মে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। নিচু ক্লাশের
রুমে আটকে-পড়া যাত্রীদের ভিড়, কেউ-কেউ চায়ের
নের বেঞ্চিতে ব'সে ঢুলছে, অনেকে মালপত্র নিয়ে
বই প'ড়ে থাকলো। রাত্রিটা কী-কষ্টেই কাটলো এদের।
সেই তরুণ দম্পতী—বিকাশবাবুর হঠাৎ মনে পড়লো—

সেই যারা কাল রাত্রে ওয়েটিংরুমের দরজায় একটুখানি দাঁড়িয়েই ফিরে গিয়েছিলো, আর যাদের নিয়ে কথা বলতে-বলতে চার জন প্রৌঢ় সমস্ত রাত কাটিয়ে দিলো—হ্যাঁ, তাদের নিয়েই তো কথা ;—মানুষের বদল হয়, কিন্তু ভাবের, অনুভূতির তো বদল নেই—সেই তরুণ দম্পতী কোথায় ?

ঘুরতে-ঘুরতে দৈবাৎ তাদের চোখে পড়লো। প্ল্যাটফর্মে যেখানে মাল ওজনের কল বসানো, সেখানে প্যাকিংকেসের স্তূপের পিছনে ছোট্ট একটু জায়গা তারা খুঁজে নিয়েছে। ভালোই জায়গা ;—মালপত্রের তৈরি দেয়ালে শীতের হাত, লোকের চোখ, দুটোই তারা এড়িয়েছে। বিকাশবাবুর সাহিত্যিক-চোখ একটু দেরি করলো এই দৃশ্যের উপর। এই অতি প্রকাশ্য স্টেশনের মধ্যেও কেমন নিরিবিলি নিবিড় জায়গা খুঁজে পেয়েছে এরা ; ওরই মধ্যে ছোট্ট বিছানা পেতে একটাই কম্বলের তলায় কী সুখেই ঘুমোচ্ছে। কোনো প্রাসাদের আরাম পেলেও আজকের দিনে এর বেশি সুখ এদের হ'তো না। আলো কম, মুখ ভালো দেখা যায় না, তবু বোঝা যায় যে ঘুমের মধ্যেও পরস্পরের অস্তিত্ব এরা ভোলেনি, ঘুমের মধ্যেও পরস্পরকে কাছে পাওয়ায় এরা পরিপূর্ণ।

বিকাশবাবু আস্তে স'রে এলেন সেখান থেকে। ক্রমে আলো ফুটলো, লোকজনের চলাফেরা শুরু হ'লো, একটু পরে খবর এলো যে, ট্রেন আসতে আর দেরি নেই। সঙ্গে-সঙ্গে সারা স্টেশন সরগরম।

কনট্র্যাক্টর, ডাক্তার এবং বিলির চাকুরে, কুলির মাথায় মালপত্র চাপিয়ে একে-একে বেরিয়ে এলেন। ভোরের প্রথম আলোয় ধূসর দেখালো তাঁদের, অনিদ্রায় এবং গালের দাড়িতে একটু বেশি বুড়োও দেখালো। চার জনের পরস্পরে দেখা হ'লো, কিন্তু আর-কোনো কথা হ'লো না—আস্তে একবার 'এই যে—' ব'লেই দূরে-দূরে স'রে গেলেন তাঁরা। রাত্রি যাঁদের একসঙ্গে কাটলো দেয়ালে-ঘেরা অদ্ভুত অন্তরঙ্গতায়, এখন দিনের আলোয় ব্যস্ত-হওয়া প্ল্যাটফর্মে সেই চার জন, পরস্পরকে আর চিনলেনই না। গাড়ি যখন এলো, তখনও—বোধহয় ইচ্ছে ক'রেই—আলাদা-আলাদা কামরায় তাঁরা উঠে বসলেন, কালকের রাত্রিটাকে মুছে ফেলাই যেন তাঁদের ইচ্ছা। শুধু সাহিত্যিকটি জানলা দিয়ে বার-বার তাকালেন সেই তরুণ দম্পতীকে আর-একবার দেখবার আশায়, কিন্তু তারা যে কখন কোন কামরায় উঠে বসলো কে জানে—না কি টুণ্ডলাতেই পড়ে থাকলো—ভিড়ের মধ্যে তাদের আর দেখা গেলো না।

সমাপ্ত